BDeBooks.com

Read Online

pdf

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

শিখর থেকে শিখরে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

এমন সুন্দর এই পার্বত্য প্রকৃতি, এখানে যেন মানুষকে মানায় না। কিন্তু মানুষ ছাড়া এই প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করবে কে ? আর, মানুষ ছাড়া এই প্রকৃতিকে ধ্বংস করবেই বা কে ?

(সুন্দর তো নিজেকে দেখে না, অন্যের চোখেই সে সুন্দর হয়। সুন্দরের যারা বন্দনা করে, তারাই আবার সুন্দরকে ভাঙে।)

আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে পাতলা, ফিনফিনে ওড়নার মতন মেঘ। এই মেঘেদের যেন নিজস্ব একটা মেজাজ মর্জি আছে। হঠাৎ হঠাৎ সব কিছু জমাট কুয়াশার মতন ঢেকে দেয়, আবার এক নিমেষে গড়িয়ে যায় উপত্যকার দিকে। কখনো সেই মেঘের পাড় বোনা হয় রোদের ঝিলিকে। আবার কখনো মনে হয়, ধুলো উড়িয়ে খেলা করছে এক পাল বাচ্চা হাতি। কালিদাস যেমন লিখেছেন।

খানিকটা দুরন্ত বাতাস এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল সব মেঘ। দশদিক ঝকঝক করে উঠলো রোদে। পাহাড়ের রোদ বেশি উজ্জ্বল হয়। বরফ যেন আয়না। দূরে দেখা যাচ্ছে পাশাপাশি দুটি বর্তুল চূড়া। যেন ওখানে শুয়ে আছে এক দিগঙ্গনা। সমস্ত পৃথিবীটাই এখানে এক উদ্যান। বিশাল বিশাল গাছগুলি মাধ্যাকর্ষণ অগ্রাহ্য করে এত উঁচুতে উঠে গেছে, যেন কথা বলছে আকাশের সঙ্গে। পাইন আর চিনার, দীর্ঘ তরু কিন্তু ছন্দোময় গড়ন। ভূমির সব পাথর ঢেকে আছে গুল্মে। কত রকম নাম না জানা ফুল। বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন রং, ওরা দু' একদিনের জন্য এমন নিখুঁত রূপ নিয়ে ফুটে থাকে, আবার ঝরে যায়। প্রজাপতি, ভ্রমর, ফড়িং ছাড়া ওদের কেউ ছোঁয় না। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, এখানে কোনোদিন কোনো মানুষের পায়ের স্পর্শ লাগেনি।

অবশ্যই এ ধারণা ভুল। মানুষ কোথায় না গেছে। পৃথিবীটাকে তছনছ করতে মানুষ কি কিছু বাকি রেখেছে ?

বরফ মাখা পাহাড়-চূড়া, বড় বড় মহীরূহের সমারোহ, আকাশের নীল কোমলতা, ফুল থেকে ফুলে পতঙ্গদের ওড়াউড়ি, এই দৃশ্যের নির্মাণে শ্রেষ্ঠ

আবহ সঙ্গীত হতে পারে নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যেই আছে মহাবিশ্বের ধ্বনি।

আচম্বিতে সেই নিস্তব্ধতাকে ছিন্ন ভিন্ন করে শোনা যায় বিকট কামান গর্জন। মর্টার, সাব মেশিনগান। মাটি ফুঁড়ে যেন শুরু হয় নরকের যন্ত্র-চিৎকার। দূর পাল্লার গোলা ফাটার আওয়াজে কানে তালা লেগে যায়। মেঘের সঙ্গে মিশে যায় বারুদের ধোঁয়া। আগুনে ঝলসে যায় সবুজ অরণ্য। একটা বিশাল গাছ কোমর ভেঙে শুয়ে পড়ে। একটা সৈন্যভর্তি ট্রাক পাহাড়ের বাঁক ঘুরে হুড়মুড় করে এগিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ থেমে যায়। সামনে এসে পড়ছে হ্যান্ড গ্রেনেড। শিশির-ধোয়া ফুলগাছগুলোকে দলিত মথিত করে ট্রাকটা আবার মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল বিপরীত দিকে।

(যুদ্ধ। মানুষের আদিমতম পাপ। মনুষ্য সমাজের কাছে মনুষ্যত্বের ধারাবাহিক পরাজয়।)

গুলমার্গ থেকে আরও উত্তরে বারো মাইল দূরে একটা টিলার ওপরে গাছপালার আড়ালে উঠছে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর একটি ছোট ইউনিট। এখানে গোলাবর্ষণ আপাতত বন্ধ। দলটির একেবারে সামনে রয়েছে আর্মি মেজর কুলদীপ সিং। চমৎকার স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘকায় তরুণ, চক্ষু দুটি উজ্জ্বল, তাতে বুদ্ধির ছটা আছে। তার এক হাতে লাইট মেশিনগান, গলায় ঝুলছে বায়নোকুলার।

মেজর কুলদীপ সিং একবার পেছন ফিরে অন্যদের থামতে নির্দেশ দিল। তারপর সে খরগোশের মতন সাবলীলভাবে বড় বড় পাথর টপকে একাই উঠে যেতে লাগলো ওপরের দিকে।

অনেক দূরে গোলাগুলি চলছে বটে, কিন্তু এখানে শত্রুপক্ষের কোনো চিহ্ন নেই।

একটা ওক গাছের আড়ালে পজিশান নিয়ে দাঁড়ালো কুলদীপ। সে একবার ভেবে নিল, একটা স্কোয়াড নিয়ে আর বেশি এগোনো ঠিক হবে না। কিন্তু মনে হচ্ছে, এখানে এনিমি লাইনের কিছুটা দুর্বলতা আছে। অস্ত্রটা নামিয়ে রেখে দূরবীনটা চোখের কাছে আনলো সে। সামনের উপত্যকা জঙ্গলে ভরা। তার মধ্যে চোখে পড়ে পায়ে চলা সরু একটা পথ। কোনো মানুষ দেখা যাচ্ছে না। ছোটখাটো একটা জলপ্রপাতের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

শত্রুদের খুঁজতে খুঁজতে কুলদীপের দূরবীন একটু ওপরের দিকে উঠে গেল। সে এখন দেখছে তুষার মাখা পর্বত শৃঙ্গ। রোদ পড়ে সোনার মতন

ঝকঝকে করছে সেই চূড়াটি। যেন যুদ্ধের কথা ভুলে গিয়ে সে মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাকিয়ে রইলো সেই পাহাড়ের দিকে।

এখান থেকে বেশ খানিকটা নীচে, আর্মি ক্যাম্পে এই মুহূর্তে চলছে এক নাটকীয় উত্তেজনা। ক্যাম্পের মধ্যে একটা ওয়্যারলেস সেট ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সাত-আটজন আর্মি অফিসার। তাদের চোখে মুখে দারুণ উত্তেজনা। আরও কয়েকজন ছুটে আসছে তাঁবুর দিকে। ভেতরে এসে তারা জিজ্ঞেস করছে, খবর এসেছে? খবর এসেছে? একজন ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করছে, চুপ!

একটু পরে ওয়্যারলেস অপারেটর কান থেকে হেড ফোন খুলে ফেললো। একজন অফিসার ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞেস করলো, কী বোঝা গেল না?

অপারেটরটির সারা চোখ মুখে ক্লান্তি। তবু সে হেসে, মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, হ্যাঁ! কনফার্মড! যুদ্ধ থেমে গেছে। সত্যি থেমে গেছে। ঠিক দুপুর একটা থেকে সিজ ফায়ার ডিক্লেয়ার করা হয়েছে!

বাকি সবাই সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের হাত ঘড়ি দেখলো। এখন একটা বেজে কুড়ি মিনিট। সবাই এক সঙ্গে উল্লাসের চিৎকার করে উঠলো।

কয়েকজন অফিসার ছুটে বেরিয়ে গেলেন তাঁবুর বাইরে। বিউগিলে বেজে উঠলো যুদ্ধ-বিরতির সুর। সাধারণ সৈন্যরা রাইফেল ফেলে দিয়ে নাচতে লাগলো কয়েকজন। একজন একটা রামের বোতল খুলে বড় একটা চুমুক দিতেই অন্য একজন সেটা কেড়ে নিল তার কাছ থেকে।

সকলের ফুর্তি দেখলে এই মুহূর্তে মনে হয়, মানুষ আসলে যুদ্ধ চায় না। তবু যুদ্ধ হয়। একটা যুদ্ধ থেমে গেলে পৃথিবীর অন্য কোথাও আর একটা যুদ্ধ লাগে।

তাঁবুর মধ্যে কয়েকজন এখনো ওয়্যারলেস অপারেটরকে ঘিরে ধরে নানা প্রশ্ন করছে। হঠাৎ যুদ্ধ থামলো কেন? শত্রুপক্ষ কি হেরে গিয়ে সারেন্ডার করলো?

অপারেটরটি বললো, না। দু' পক্ষই সিজ ফায়ার ঘোষণা করেছে।

অফিসারদের মধ্যে একজন, মেজর রবি দত্ত আপন মনে চেঁচিয়ে উঠলো, তা হলে এই হতভাগা যুদ্ধটা লেগেছিল কেন? এতে কার কী লাভ হলো?

অন্য কেউ অবশ্য এ আলোচনায় যোগ দিল না। আর্মি অফিসারদের এ রকম প্রশ্ন করার নিয়ম নেই। মেজর রবি দত্ত অত সব নিয়ম কানুন মানে না। সে খুব ফুর্তিবাজ, পাগলাটে ধরনের মানুষ। ঠিক যেন আর্মি অফিসার

হিসেবে তাকে মানায় না। যখন তখন মাথার টুপি খুলে ফেলে। সিগারেটের শেষ টুকরো যেখানে সেখানে ছুঁড়ে দেয়। মাঝে মাঝে জামার বোতাম খুলে নিজের বুকে হাত বুলোনো তার বাতিক। এ বিষয়ে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে সে হাসতে হাসতে বলে, আমি ভাই নিজেকেই নিজে আদর করি। আর কেউ কখনো করবে কি না কে জানে!

রবি অপারেটরের পাশে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করলো, রহমান, সব কটা ফরোয়ার্ড পোস্টে খবর পাঠানো হয়েছে?

রহমান বললো, চেষ্টা করছি। দু'একটা জায়গা থেকে কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না।

রবি ঘাড় ঘুরিয়ে অন্যদের দিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, মেজর কুলদীপ সিং কোথায়?

কেউ সঠিক উত্তর দিতে পারলো না।

রবি বললো, রহমান, গেট ইন টাচ উইথ কুলদীপ।

সবাই জানে যে এই দু'জন মেজর পরস্পরের একেবারে প্রাণের বন্ধু। প্রায় ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে মানুষ হয়েছে, এক সঙ্গে লেখা পড়া শিখেছে, এক সঙ্গে আর্মিতে ঢুকেছে। দু'জনের স্বভাবের অবশ্য বেশ তফাত আছে। কুলদীপ একটু গম্ভীর, একটু সিরিয়াস ধরনের। আর রবি খুব উচ্ছল আর ফুর্তিবাজ।

রহমান আর রবি ওয়্যারলেসে কুলদীপকে খবর দেবার খুব চেষ্টা করলো, কিন্তু কিছুতেই যোগাযোগ করা গেল না।

রবি তখন একটা জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

চতুর্দিকের পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বিউগলের আওয়াজ। এক সময় হঠাৎ তা থেমে গেল। শুধু জিপের শব্দ।

কুলদীপ অবশ্য বিউগলের ধ্বনি শুনেছে। আরও জনা পাঁচেক জওয়ানের সঙ্গে সে টিলা থেকে নামছে ফিরে যাওয়ার জন্য। একজনের হাতে একটা ভাঙা ওয়্যারলেস সেট। অন্য একজন আহত, তাকে ধরে ধরে নামানো হচ্ছে। খানিকটা দূর থেকে রবির গলার ডাক শোনা গেল, কুলদীপ! কুলদীপ!

কুলদীপ দূরবীন দিয়ে একবার দেখে নিল। তারপর নীচের জিপটার দিকে নামতে লাগলো সবাই মিলে।

কাছাকাছি আসতেই রবি চেঁচিয়ে বললো, কুলদীপ, This damned war is

over !

কুলদীপ তা বুঝতে পেরেছে, সে শুকনো ভাবে হাসলো, তারপর আহত সৈনিকটিকে ধরাধরি করে তুলে দিল জিপের মধ্যে। কাঁধ থেকে এল এম জি-টা খুলে সেটাও জিপের মধ্যে ছুঁড়ে দিল।

রবি বললো, স্টুপিডিটি ! দশ দিন ধরে এই যুদ্ধ চালিয়ে কি লাভ হলো ? কোটি কোটি টাকা নষ্ট হলো, আর মরলো কিছু মানুষ !

কুলদীপ বললো, আমার ছুটি নষ্ট হলো। ছুটি থেকে আমাকে ডেকে আনিয়ে দশটা দিন বাজে খরচ হয়ে গেল।

রবি কুলদীপের পিঠে এক চাপড় মেরে বললো, আমি এবার তোকে আবার ছুটিতে পাঠিয়ে দেবো। সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে একা একা সময় কাটাবি, কেউ তোকে ডিসটার্ব করবে না।

কুলদীপ বললো, আমার একটা লেকচার টুরে যাওয়ার কথা ছিল। বম্বে, দিল্লি, কলকাতা। ক্যানসেল করে দিয়েছিলাম, এবার যেতে পারবো।

অন্য জওয়ানরা জিপে উঠে পড়েছে। কুলদীপ আর রবি সামনে ড্রাইভারের পাশে বসতে যাবে এই সময় দূরে হঠাৎ একটা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল।

কুলদীপ আর রবি পরস্পরের দিকে তাকালো।

কুলদীপ বললো, ওখানে আবার কি হচ্ছে ! বাস্টার্ডগুলো এখনো খবর পায়নি ?

রবি বললো, ওরা বিউগ্‌ল শোনেনি ? কালা হয়ে গেছে নাকি ? আর গোলাগুলির শব্দ শুনতে চাই না। আজ লাঞ্চের সময় ভালো মিউজিক শুনবো।

কুলদীপ ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি সাদা ফ্লাগ আনো নি ? টু বী অন দা সেফ সাইড, একটা সাদা ফ্লাগ উড়িয়ে দাও।

রবি একটু এগিয়ে গিয়ে সীমানার উদ্দেশে বললো, হেই ইউ ইডিয়েটস ! গেট ব্যাক টু লাঞ্চ। হ্যাভ আ নাইস ডে।

ড্রাইভার সাদা পতাকা খুঁজছে। জিপের মধ্যে অন্য সৈনিকরা একটা গান ধরেছে। নীচে দাঁড়িয়ে কুলদীপ গলা মেলাচ্ছে তাদের সঙ্গে। রবি একটু এগিয়ে গেছে।

খানিকটা দূরে পাহাড়ের খাঁজ দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে বিপক্ষের কয়েকজন সৈন্য। তারা সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তারপর তাদের হাতের সাব মেশিন গান এক সঙ্গে গর্জে উঠলো।

কুলদীপ হাত তুলে রবিকে ডাকতে গেল। তার আগেই রবি গুলি খেয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে। কুলদীপ সেদিকে ছুটে যাবার চেষ্টা করতেই দু'জন সৈন্য চেপে ধরলো তাকে। অন্যরা অস্ত্র হাতে নেমে পড়ে কভার নিচ্ছে। তার আগেই আর এক ঝাঁক গুলি এসে কুলদীপকেও ফুঁড়ে দিল। জিপটা স্টার্ট নিয়ে এগোতে গিয়েও উল্টে গেল এক পাশে।

সীমান্তের ওপাশে এবার বেজে উঠলো যুদ্ধ বিরতির বিউগলের সুর। মাত্র মিনিট পাঁচেকের ব্যবধান। অন্য পক্ষ পাঁচ মিনিট আগেও যুদ্ধ বিরতির খবরটা পেলে এখানে এই অকারণ খণ্ডযুদ্ধটা হতো না।

॥ ২ ॥

দশ দিনের যুদ্ধে কুলদীপ ও রবির গায়ে একটা আঁচড়ও লাগেনি, কিন্তু যুদ্ধ বিরতির পর, একেবারে অকারণে দু'জনেই আহত হলো সাঙ্ঘাতিক ভাবে। আরও তিনজন সৈন্যও আহত হয়েছে। কিন্তু বেশি ব্যস্ততা কুলদীপকে নিয়ে। কারণ কুলদীপ সিং তো শুধু একজন সাধারণ আর্মি মেজর নয়। সে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। সমস্ত পৃথিবীর পর্বত অভিযাত্রীরা তার নাম জানে, সে মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেছে।

আর্মি ক্যাম্প থেকে একটা অ্যাম্বুলেন্সে রবি আর কুলদীপকে নিয়ে আসা হলো শ্রীনগরে। রবির মুখখানা একেবারে নিথর, সে বেঁচে আছে কিনা বোঝাই যায় না। কুলদীপের মুখখানা কুঞ্চিত, মাঝে মাঝে সে মাথা নাড়ছে ও অস্ফুট ভাবে কী যেন বলবার চেষ্টা করছে।

প্রায় আচ্ছন্ন অবস্থায় কুলদীপ দেখছে অন্য একটা দৃশ্য। সেখানে তার পোশাক অন্য রকম, পর্বত অভিযাত্রীদের মতন, পিঠে বাঁধা অক্সিজেন সিলিন্ডার, হাতে আইস অ্যাক্স। চতুর্দিকে শুধু বরফ, তার মধ্যে কুলদীপ পা পিছলে একটা খাদের মধ্যে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। গড়াচ্ছে তো গড়াচ্ছেই। সে যেন তলিয়ে যাচ্ছে অতলে। কিছু একটা ধরার চেষ্টা করেও সে পারছে না। নীচের দিকের ঘন অন্ধকার টানছে তাকে।

হঠাৎ যেন এক সময় পরিপূর্ণ জ্ঞান ফিরে পেয়ে কুলদীপ চোখ মেলে তাকালো। বলে উঠলো পানি! পানি!

তার শিয়রের কাছে বসে আছেন ডাক্তার রায়। তিনি একটা ভেজা তুলো থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল দিতে লাগলেন কুলদীপের ঠোঁটে। কুলদীপ আবার চোখ বুজলো।

পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে ছুটেছে অ্যাম্বুলেন্স। মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছে। পাহাড়ের পর পাহাড়ে সুদীর্ঘ পথ, যেন শেষ হবে না।

শ্রীনগর এয়ারপোর্টে যখন গাড়িটা পৌঁছোলো তখন সেখানকার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। একটা এয়ার ফোর্সের বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করা হয়েছে বটে, কিন্তু পাইলট চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। স্ট্রেচারে করে বিমানে তোলা হলো কুলদীপকে। ডাক্তার রায় এসে পাইলটের পাশে দাঁড়ালেন। পাইলট বললেন, এই ওয়েদার কন্ডিশনে আমি টেক অফ করবো কী করে? খুবই রিস্কি!

ডাক্তার রায় বললেন, যে-কোনো উপায়ে মেজর কুলদীপ সিংকে আজ দিল্লির হাসপাতালে নিয়ে যেতেই হবে। দেরি করলে আর কোনো আশাই থাকবে না।

পাইলট কাঁধ ঝাঁকালেন। খুব তীব্র একটা বিদ্যুৎ চমক ও বজ্রপাতের শব্দ হলো এই সময়।

বিমানের মধ্যে কুলদীপের তখনও আচ্ছন্ন অবস্থা। কিন্তু একেবারে অজ্ঞান নয়। সে দেখছে অন্য দৃশ্য। পর্বত অভিযাত্রী কুলদীপ একটা ঝুলন্ত দড়ি ধরে একটু একটু করে উঠছে। তার মুখ কুঁকড়ে গেছে। একবার তার পা পিছলে গেল! রবি সাহায্য করছে তাকে।

ঝড় বিদ্যুতের মধ্যেই বিমানটি কোনো রকমে এসে পৌঁছোলো দিল্লিতে। কুলদীপকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হলো হাসপাতালে। খবর পেয়ে কুলদীপের মা আগেই জলন্ধর থেকে চলে এসেছেন দিল্লিতে। হাসপাতালে ছুটে এসেছেন হিমালয় অভিযানের কয়েকজন সহযাত্রী। সকলে মিলে কুলদীপের ক্যাবিনে ঢুকতে যেতেই বাধা দিলেন একজন ডাক্তার। পেশেন্টকে এখন কিছুতেই ডিসটার্ব করা চলবে না। কুলদীপের নাকে নল লাগানো। তার চোখ খোলা, কিন্তু সে কারুকে চিনতে পারছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। তার দৃষ্টি এক একবার ঝাপসা হচ্ছে, আবার পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আসলে সে তার মা, পাশে দাঁড়ানো একটি তরুণী ও আরও দু' একজনকে চিনতে পারছে, কিন্তু সে কোনো কথা বলতে পারছে না। তার গলার স্বর ফুটছে না। তার হাত দুটি পাশে পড়ে আছে, একটা আঙুল তোলারও সাধ্য তার নেই। শুধু চোখের তারা দুটো নড়ছে মাঝে মাঝে।

কুলদীপের মা হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা গুরু নানকের ছবি বার করলেন। তারপর ডাক্তারকে মিনতি করলেন একবার ছেলের কাছে যাবার জন্য। ডাক্তার দোনামোনা করে অনুমতি দিলেন ঠিক এক মিনিটের জন্য। মা কাছে

গিয়ে ছেলের মাথায় হাত রাখলেন। ছবিটা বালিশের তলায় গুঁজে দিয়ে ফিসফিস করে বললেন, গুরু তোকে দেখবেন!

তাঁর চোখে টলটল করছে জল, কিন্তু ছেলের সামনে তিনি কাঁদবেন না বলে ফিরিয়ে নিলেন মুখ।

একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, হোম মিনিস্টার মেজর কুলদীপ সিংকে দেখতে আসতে চান। আগামী কাল ব্যবস্থা করা যাবে।

ডাক্তার গম্ভীর ভাবে বললেন, হোম মিনিস্টারকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

কুলদীপের মায়ের পাশে যে তরুণীটি দাঁড়িয়ে আছে, তার নাম গীতা। গীতা এক দৃষ্টে চেয়ে আছে কুলদীপের দিকে। তার চোখে পলক পড়ছে না। কুলদীপও দেখছে গীতাকে, একেকবার তার চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, তখন সে দেখছে একটা সুন্দর পাহাড়ী শহরের দৃশ্য, দার্জিলিং কিংবা কালিম্পং, নির্জন রাস্তা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে গীতা, হলুদ রঙের শাড়ি পরা, হাওয়ায় তার আঁচল উড়ছে স্বর্গের পতাকার মতন। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে বসে গীতা মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে তাকাচ্ছে, হাসিতে ঝলমলে সেই মুখ।

আবার সে দেখছে হাসপাতালের ক্যাবিনের সামনে দাঁড়ানো গীতাকে।

কয়েকজন শুভার্থী কুলদীপের মাকে ধরে ধরে নিয়ে চললেন বাইরের দরজার দিকে। গীতা এগিয়ে গেল। সে একা একা আপন মনে হাঁটছে। তার চোখে টলটল করছে কান্না, সে রুমাল বার করে মুছে ফেললো।

হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কুলদীপের মা ব্যাকুল ভাবে গীতাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার ছেলে আমার সঙ্গে একটাও কথা বললো না কেন? আমায় চিনতে পারেনি? ওর চোখ দেখে মনে হলো না যে ওর জ্ঞান আছে?

গীতা বললো, হ্যাঁ, জ্ঞান আছে, মনে হলো। চোখের তারা নড়ছিল।

তা হলে কথা বললো না, কেন?

নিশ্চয়ই ওর কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছে!

ওরা বললো গুলি লেগেছে পিঠে। তাতে কি বেশি ভয় আছে? গুলিটা বার করে নিয়েছে, তাই না?

হ্যাঁ, গুলি বার করে নিয়েছে।

তবে কথা বলতে পারবে না কেন?

গুলিটা যদি স্পাইনাল কর্ডে লাগে...ভালো হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবে!

কুলদীপের মাকে যত্ন করে একটা গাড়িতে তুলে দিল গীতা। কিন্তু সে নিজে উঠলো না। সে জানালো যে কাছেই তার একটা কাজ আছে।

গাড়িটা চলে যাবার পর গীতা আবার ঢুকে এলো হাসপাতালের মধ্যে। দ্রুত উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে। কুলদীপের ক্যাবিনের কাছে যে ডাক্তারের সঙ্গে কথা হয়েছিল, তাকে দেখতে পেয়ে গীতা জিজ্ঞেস করলো, রবি দত্তকে কোথায় রাখা হয়েছে?

ডাক্তারটি প্রথমে রবির নাম শুনে চিনতে পারলেন না। গীতা বললো, মেজর রবি দত্ত, মেজর কুলদীপ সিং-এর সঙ্গে একই সঙ্গে আহত হয়েছে। তাকেও আনা হয়েছে দিল্লিতে।

ডাক্তারটি গীতাকে অন্য একটা জায়গায় গিয়ে খোঁজ করতে বললেন।

গীতা চলে এলো দোতলায় একটা লম্বা হল ঘরের সামনে।

সেখানে সারি সারি শয্যা। হল ঘরের অন্য প্রান্তে কয়েকটি ক্যাবিন। গীতা এগোতে যেতেই একজন কর্মচারী তাকে বাধা দিল। ভিজিটিং আওয়ার্স ওভার হয়ে গেছে, এখন সে যেতে পারবে না। গীতা অনুনয় করলো, লোকটি কিছুতেই শুনবে না। কাছাকাছি একজন ডাক্তারকে দেখতে পেয়ে গীতা বললো যে সে মেজর দত্তর একজন আত্মীয়। একবার দেখে যেতে চায়। ডাক্তারটিও দুদিকে মাথা নাড়লেন।

গীতা জিজ্ঞেস করলো, রবি দত্ত কেমন আছে?

ডাক্তারটি বললেন, সবাই মিলে আশা করা যাক, নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠবেন।

গীতা ক্ষুণ্নমনে ফিরে চললো। সে আর কোনো দিকে দেখছে না, শুধু নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। চার পাশে অন্যান্য ব্যস্ত মানুষের পা। গীতার মনে পড়ে গেল একটি দিনের কথা।

দার্জিলিং-এর হিল কার্ট রোড। গীতার দু'পাশে কুলদীপ আর রবি। কুলদীপ পরে আছে সামরিক পোশাক আর রবি ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মতন সাদা প্যান্ট-শার্টের ওপর নীল বর্ডার দেওয়া সাদা সোয়েটার পরেছে। কুলদীপের মুখে চাপা হাসি আর রবি প্রগল্‌ভ।

দুই বন্ধু। তাদের মাঝখানে একটি নারী। কিন্তু এই নারীকে নিয়ে বন্ধু দু'জনের মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতা নেই। গীতা ওদের কারুরই প্রেমিকা নয়,

তখন পর্যন্ত বান্ধবী। প্রেমিক হবার সব রকম যোগ্যতা কুলদীপের চেয়ে রবিরই বেশি। কুলদীপের চেয়ে সে সুদর্শন, রবির কথাবার্তার মধ্যে অনেক চাকচিক্য আছে, সে নানারকম মজা করতে পারে, সেই তুলনায় কুলদীপ মুখচোরা।

রবি রাস্তা থেকে একটা পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে গীতাকে জিজ্ঞেস করলো, কোন্ গাছটায় লাগাবো বলো?

গীতা বললো, পারবেন? আচ্ছা, ঐ গাছটায় লাগান তো।

সে আঙুল তুলে রাস্তার ধারের একটা পাইন গাছ দেখিয়ে দিল।

রবি ক্রিকেট খেলার পাকা বোলারের মতন খানিকটা দৌড়ে গিয়ে হাত ঘুরিয়ে পাথরটা ছুঁড়েই বললো, আউট।

পাথরটা ঠিক পাইন গাছের গুঁড়ির মাঝখানে লাগলো। গীতা হাততালি দিয়ে উঠলো।

কুলদীপ বললো, আর্মিতে যোগ না দিয়ে রবির মন দিয়ে খেলাধুলো করা উচিত ছিল। রবি ফুটবল আর ক্রিকেট দুটোই ভালো খেলে। ও ইচ্ছে করলেই ইণ্ডিয়ান টিম-এ চান্স পেতে পারতো।

রবি বললো, তুই আর্মিতে যোগ দিলি কেন? তোরও তো উচিত ছিল ভালো করে ছবি আঁকার চর্চা করা।

তারপর গীতার দিকে ফিরে বললো, ও কত ভালো ছবি আঁকে জানো?

গীতা ভুরু তুলে বললো, না, জানি না তো? উনি ছবি আঁকেন?

রবি বললো, দেখবে?

রবি নিজের পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করলো। সেটাতে রয়েছে রঙিন পেন্সিলে আঁকা কয়েকটি ফুলের স্কেচ।

কুলদীপ লজ্জা পেয়ে কাগজটি কেড়ে নেবার চেষ্টা করেও পারলো না।

গীতা কাগজটা নিয়ে মুগ্ধ ভাবে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, কী দারুণ ভালো ছবি।

রবি বললো, আজ সকালেই এঁকেছে। তবে, একটা কী জানো গীতা, ওকে কতবার বলেছি, আমার একটা ছবি আঁকতে, তা কিছুতেই আঁকবে না। ও যত রাজ্যের পাহাড়-পর্বত, ফুল-পাখির ছবি আঁকে। মানুষের ছবি কিছুতেই আঁকে না ও ব্যাটা এরপর যদি তোমার একটা ছবি না আঁকে, তা হলে আমি ওর সব রং-তুলি কেড়ে নেবো। তুমি বেশ এই রকম একটা জায়গায় রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়াবে, পেছনে পাহাড়ের ব্যাক গ্রাউণ্ড, তোমার মুখে সন্ধেবেলার সূর্যের

আলো এসে পড়েছে...

কুলদীপ লাজুক গলায় বললো, আমি তো ছবি আঁকা শিখিনি। মানুষ আঁকতে ঠিক পারি না। মানুষকে শুধু রং আর রেখা দিয়ে ফুটিয়ে তোলা তো খুব শক্ত। মানে, এমনি মানুষের চেহারার ছবি আঁকা যেতে পারে, কিন্তু ঠিক ভেতরের মানুষটাকে ফুটিয়ে তোলা...সে সব বড় বড় আর্টিস্টের কাজ...আমার সে ক্ষমতা নেই।

গীতা বললো, এই ফুলের ছবিগুলোও চমৎকার হয়েছে। এগুলো কী ফুল ?

কুলদীপ বললো, এই রে, নাম তো জানি না। সিকিমে আমরা যখন মাউন্টেনিয়ারিং-এর ট্রেইনিং নিতে গিয়েছিলাম, তখন রাস্তার পাশে এই রকম কত ফুল দেখেছি।

গীতা বললো, আপনি একজন আর্টিস্ট। আচ্ছা, আপনি এত ভালো ছবি আঁকতে পারেন, রবি খেলাধুলোয় এত ভালো, অথচ আপনারা দু'জন নিজেদের লাইনে না থেকে আর্মিতে যোগ দিলেন কেন ?

রবি হঠাৎ সুর পাল্টে গম্ভীর ভাবে বললো, লেডি, ডোন্ট ইউ মেক আ মিসটেক। উই বোথ আর ভেরি এফিশিয়েন্ট আর্মি অফিসার্স। অ্যাণ্ড উই থরোলি এনজয় আর্মি লাইফ !

গীতা একটু অবজ্ঞার সঙ্গে মুখ ব্যাঁকালো।

গীতার বাবা চতুর্ভুজ সাকসেনা রিটায়ার্ড আর্মি করনেল। ওর দুই দাদা আছে এয়ার ফোর্সে। গীতার ঠাকুর্দাও ছিলেন ব্রিটিশ আর্মিতে। বাচ্চা বয়েস থেকে সে বাড়িতে সেনাবাহিনীর লোকজনকেই দেখছে। সকলের কথাবার্তা তার এক ধরনের মনে হয়।

কুলদীপ সিং আর রবি দত্ত যেন কিছুটা আলাদা। ওরা অবশ্য দার্জিলিং এসেছে ট্রেইনিং নিতে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি টিম এভারেস্ট অভিযানে যাবে, এটাই ভারতীয়দের প্রথম এভারেস্ট অভিযান। সারা ভারত থেকে বাছাই করে সত্তরজন আর্মি অফিসারকে ট্রেইনিং-এর জন্য পাঠানো হয়েছে এখানকার মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে। ওদের ট্রেইনিং দিচ্ছেন তেনজিং নোরগে।

কুলদীপ লাজুক গলায় গীতাকে বললো, ফুলের ছবি দুটো আপনার পছন্দ হয়েছে, আপনি ও দুটো নেবেন ?

রবি বললো, এই, তুই আমাকে ছবি দুটো দিয়েছিলি, এখন আবার—

কুলদীপ তাড়াতাড়ি বললো, তোকে আবার এঁকে দেবো !

রবি বললো, ইডিয়েট, গীতার জন্যই তো নতুন করে এঁকে দিতে পারিস। গীতাকে এই রকম একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে ওর হাতে থাকবে একটা গোলাপ। সেই ছবির নাম হবে, আ প্রিটি উয়োম্যান উইথ আ রোজ...

॥৩॥

মুহূর্তের উত্তেজনায় তার প্রিয় বন্ধু রবিকে বাঁচাবার জন্য গোলাগুলি উপেক্ষা করে ছুটে যাচ্ছিল, সেই সময় কয়েকজন জওয়ান তাকে ধরে ফেলে। সরাসরি বুকে গুলি লাগলে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হতো। পিঠে গুলি লাগায় তার মৃত্যু হলো না বটে, তবে শিরদাঁড়া জখম হওয়ার ফলে তার শরীরের অনেক স্নায়ু বিকল হয়ে গেল, কথা বলার শক্তিও চলে গেল। যদিও তার মস্তিষ্ক রইলো অবিকল। প্রথম কয়েকদিনের আচ্ছন্নতা কেটে যাওয়ার পর সে পারিপার্শ্বিক সব কিছুই বুঝতে পারে, সব কিছুই শুনতে পায়, কিন্তু নিজে কোনো সাড়া দিতে পারে না, হাতের একটা আঙুলও তুলতে পারে না। যতক্ষণ জেগে থাকে, সে শুধু স্মৃতি রোমন্থন করে, কাছাকাছি অতীতের অনেক ঘটনা তার চোখের সামনে ছবির মতন ভাসতে থাকে। যদিও সেই স্মৃতির মধ্যে কোনো পারম্পর্য নেই।

তার মা ও ভাই বোনেরা নিয়মিত তাকে দেখতে আসে। গীতা আসে। সরকারের বড় বড় অফিসার এবং এভারেস্ট অভিযানের কর্তা ব্যক্তিরা আসেন। কুলদীপের বাবা আছেন পাঞ্জাবের এক গ্রামে, তিনি অশক্ত বলে আসতে পারেন না। কিন্তু তিনি একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার পাঠিয়েছেন, সেই ডাক্তার নিজস্ব ওষুধ দেবার চেষ্টা করে আরও জটিলতার সৃষ্টি করেন।

মা কিংবা গীতা যখন আসে, তখনই কুলদীপ ভেতরে ভেতরে বেশি উত্তেজনা বোধ করে। তার খুবই ইচ্ছে হয় ওদের সঙ্গে কিছু কথা বলার। কিন্তু কিছুতেই তার গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। সে হাত তুলে ছুঁতেও পারে না ওদের। এ রকম অসহায় অবস্থায় সে ফিরে যায় স্মৃতির মধ্যে।

তার মনের মধ্যে আর একটা প্রশ্নও আকুলি-বিকুলি করে। রবি কেমন আছে ? রবি কোথায় ? কিন্তু এরও উত্তর জানার কোনো উপায় নেই।

মা কিংবা গীতা কিংবা পর্বত অভিযাত্রীর বন্ধুরা এসে তাকে কথা বলাবার চেষ্টা করলে কুলদীপ শুধু চেয়ে থাকে। সে দেখতে থাকে স্মৃতির ছবি।

কুলদীপের নাক থেকে নল খুলে নেওয়া হয়েছে, এখন তাকে কিছু কিছু

তরল খাবার দেওয়া হয়। একজন নার্স চামচে করে তাকে খাইয়ে দেয় টোমাটো সুপ। মা দাঁড়িয়ে আছেন পাশে। নার্সকে তিনি অনুরোধ করলেন, তিনি নিজের হাতে ছেলেকে একটু খাইয়ে দিতে চান।

কুলদীপ মুখ দিয়ে একটা শব্দ বার করার প্রবল চেষ্টা করছে। কষ্টে কুঁকড়ে যাচ্ছে তার মুখ। কিছুতেই শব্দ বেরুচ্ছে না। সে চোখ বুজে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে সে দেখতে পেল, তাদের গ্রামের বাড়ির একটা দৃশ্য। বাগানে বসে ছবি আঁকছে কুলদীপ, দূরের রাস্তা দিয়ে ছাতা মাথায় হেঁটে আসছেন মা। তিনি কুলদীপের পেছনে এসে দাঁড়ালেন। একটুক্ষণ ছবি আঁকা দেখে মৃদু স্বরে ডাকলেন, দীপ!

কুলদীপ চমকে ফিরে তাকালো।

মা বললেন, দীপ, তুই সত্যি পাহাড়ে যাবি ঠিক করেছিস?

কুলদীপ বললো, হ্যাঁ, মা। এভারেস্ট এক্সপিডিশান টিমে আমাকে সিলেক্ট করা হয়েছে, এটা একটা বিরাট সম্মান। এরকম চান্স ক'জন পায়?

মা বললেন, কিন্তু তোর বাবার ইচ্ছে নেই।

কুলদীপ বললো, তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বলবে। তুমি আমাকে সাপোর্ট করবে না মা?

মা বললেন, কিন্তু এভারেস্টে উঠতে গেলে কত রকম অ্যাকসিডেন্ট হয়...

কুলদীপ বললো, মা, তুমি অ্যাকসিডেন্টের ভয় পাচ্ছো : অ্যাকসিডেন্ট কোন্ জায়গায় না হতে পারে? এমনকি এখানেও আমাদের মাথার ওপরে হঠাৎ একটা sky lab ভেঙে পড়তে পারে!

হেসে উঠে কুলদীপ আবার বললো, তোমার কোনো ভয় নেই, মা। আমি আমার ঠাকুর্দার মতন অন্তত নব্বই বছর বাঁচবো! আমাদের ফ্যামিলিতে সবাই দীর্ঘজীবী!

দুটো ছবি যেন এক সঙ্গে মিলে মিশে যায়। হাসপাতালের ক্যাবিনে মা কুলদীপকে টোমাটো সুপ খাওয়াবার চেষ্টা করছেন, আর কুলদীপ দেখছে পাঞ্জাবে তাদের গ্রামের বাড়ির দৃশ্য।

সুপের চামচটা কুলদীপের মুখের কাছে এনে মা ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞেস করছেন, দীপ, দীপ, তুই আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস?

কুলদীপ প্রবল ভাবে কিছু একটা শব্দ করার চেষ্টা করছে। সে শুনতে পাচ্ছে সবই, কিন্তু তার চোখ-মুখ ফুলে উঠলেও কণ্ঠ দিয়ে কোনো স্বর বেরুচ্ছে না।

সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের দৃশ্যে কুলদীপ একটা বাচ্চা ছেলেকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিচ্ছে। দু'জনেই খুব হাসছে।

নার্স এবং ডাক্তার মাকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

দু'একদিনের মধ্যেই কুলদীপের আর একটি অপারেশন হলো। ট্রাকিয়োটমি করে তার শ্বাসনালি খুলে দেওয়া হলো খানিকটা। তার মধ্যে একটা টিউব ঢুকিয়ে সেটার অন্য দিকটা জুড়ে দেওয়া হলো একটা মোটর চালিত পাম্পের সঙ্গে। কুলদীপের বুকের মধ্যে প্রচুর ব্লাড ক্লট হয়ে আছে, সেগুলো বার করে দেওয়া খুব জরুরি। মোটর চলতে শুরু করলে কিছু কিছু ব্লাড ক্লট ঐ নল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। অসহ্য যন্ত্রণা হয় সেই সময়ে।

যন্ত্রণা কমাবার জন্য আর একটা প্রক্রিয়া শুরু হলো। তার বুকের ওপর বসিয়ে দেওয়া হলো স্টিম জ্যাকেট। গরম বাষ্পে ব্লাড ক্লটগুলো খানিকটা নরম হয়ে গেলে বেরিয়ে আসতে সুবিধে হয়। এর ফলে আবার কুলদীপের শরীরের উত্তাপ হয়ে গেল একশো পাঁচ ডিগ্রি।

ক্যাবিনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গীতা দেখে কুলদীপের এই যন্ত্রণা পাওয়ার অবস্থা। ডাক্তাররা সেই সময় তাকে কিছুতেই কাছে যেতে দেন না।

এক সময় স্টিম জ্যাকেট সরিয়ে নিয়ে ডাক্তার কুলদীপকে ইঞ্জেকশান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেন। কুলদীপকে তখন মৃতের মতন মনে হয়।

গীতা এই সময় কাছে এগিয়ে আসে। নার্সের অনুমতি নিয়ে কুলদীপের কপালে একটা হাত রাখে। গীতার নরম হাতের মাঝখানের আঙুলে একটি সবুজ পান্না বসানো আঙটি।

গীতা এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কুলদীপের দিকে। তার চোখে ভেসে ওঠে অন্য একটি দৃশ্য।

কালিম্পং-এর রাস্তায় ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে কুলদীপ। একটা দোতলা বাড়ির সামনের বাগানে ঢুকে ঘোড়ার রাশ টেনে তড়াক করে লাফিয়ে নেমে পড়লো। দারুণ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, সুঠাম তারুণ্যের প্রতিমূর্তি। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে গীতা কুলদীপ মুখ তুলে তাকালো।

দু'জনের দৃষ্টিতে যেন একটা সেতুবন্ধন হয়ে গেল।

দোতলায় গীতার পাশে এসে দাঁড়ালো রবি, তার হাতে চায়ের কাপ। সে চেঁচিয়ে কুলদীপকে জিজ্ঞেস করলো, এত দেরি হলো কেন ?

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলো কুলদীপ। একটু হেসে বললো, এভারেস্ট এক্সপিডিশনের টিম লিস্ট ফাইনাল হয়ে গেছে। আমি বাদ।

রবি দারুণ অবাক হয়ে বললো, তার মানে ? আমি কালকেও শুনে এসেছি...

গীতা বললো, রবি টিমে থাকছে, আর তোমাকে নিল না কেন ?

কুলদীপ বললো, রবি অনেক অভিজ্ঞ ক্লাইম্বার। এর আগে দু'বার এক্সপিডিশানে গেছে।

রবি বললো, তুইও প্রচুর ট্রেইনিং নিয়েছিস। তোর মতন স্ট্যামিনা আর কারুর নেই। তেনজিং নিজেই সেদিন বললো, এ ছেলেটা খুব তেজী।

কুলদীপ বললো, তবু তো চান্স পেলাম না ভাই। আমাকে রিজার্ভ লিস্টে রাখা হয়েছে। যদি শেষ মুহূর্তে কেউ একজন যেতে না পারে।

রবি বললো, তুই না গেলে আমিও যাবো না।...

...গীতা চলে যাবার পর দুপুরবেলা একলা শুয়ে আছে কুলদীপ। একজন নার্স তার দিকে পেছন ফিরে টেবিলের ওপর ওষুধপত্র গুছিয়ে রাখছে। এই সময় কুলদীপের ঘুম ভাঙলো।

কুলদীপের হাত দুটো আলগা ভাবে পড়ে আছে বিছানার পাশে। পায়ের ওপর কম্বল ঢাকা। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরে। কুলদীপ মুখ ফিরিয়ে জানলার দিকে তাকালো। রোদ্দুরকে তার মনে হলো বরফ মাখা পাহাড়। সে একটুক্ষণ চোখ বুজে আবার চোখ খুললো। আবার বরফ মাখা পাহাড়। আবার চোখ বুজে এই ছবিটা তাড়াতে চাইলো। এবার একটা সবুজ পাহাড়, চতুর্দিকে বিউগল বাজছে। মাথাটা দু'বার ঝাঁকালো কুলদীপ। আস্তে আস্তে তার বোধ পরিষ্কার হচ্ছে। এবার সে পরিষ্কার জানলার রোদ ও নার্সকে দেখতে পেল। তারপর সে তার ডান হাতটার দিকে তাকালো। ডান হাতটা একটুখানি উঠে আবার পড়ে গেল বিছানায়

কুলদীপ দ্বিতীয়বার মনের জোরে ডান হাতটা তুললো। তারপর আপন মনে বলে উঠলো, হাতটা একটু তুলতে পারছি।

চমকে ঘুরে দাঁড়ালো নার্স।

কুলদীপ তার দিকে চেয়ে বললো, হাতটা আজ নাড়াতে পারছি।

নার্স বললো, মিস্টার সিং, আপনি কথাও বলতে পারছেন। কথা বলতে পারছেন।

কুলদীপ খানিকটা অবাক হয়ে বললো, কেন, আগে বুঝি কথা বলতে পারতাম না ?

নার্স বললো, বেশি স্ট্রেইন করবেন না। একটুক্ষণ চুপ করে থাকুন। আমি ডাক্তারকে ডাকছি।

নার্স ছুটে বেরিয়ে গেল। কুলদীপ মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো ঘরটা। সে শুনতে পাচ্ছে তীব্র বিউগলের শব্দ। ঘরটা বদলে হয়ে গেল কাশ্মীর উপত্যকা। যুদ্ধ বিরতির দিন একটা জিপ গাড়ির সামনে সে আর রবি দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ ছুটে এলো এক ঝাঁক মেশিন গানের গুলি। তারা দু'জনেই লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

কিন্তু সেই দৃশ্যটাও পরের মুহূর্তে বদলে গিয়ে বরফের দেশ হয়ে গেল। বরফ ঢাকা পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে কুলদীপ। গড়াচ্ছে তো গড়াচ্ছেই।

ডাক্তার রায়কে নিয়ে নার্স ফিরে আসতেই মুছে গেল সেই ছবি। কুলদীপ দেখতে পেল দু'জনকেই। সে খুব স্বাভাবিক গলায় বললো, হ্যালো, ডকটর।

ডাক্তার একটা চেয়ার টেনে কুলদীপের পাশে বসে তাকে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

কুলদীপ জিজ্ঞেস করলো, আমার কী হয়েছিল? আমি কি পাহাড় থেকে পড়ে গেছি?

ডাক্তার বললেন, না, আপনি যুদ্ধে...

কুলদীপ বললো, যুদ্ধ তো থেমে গিয়েছিল। সিজ ফায়ার ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল, আমার স্পষ্ট মনে আছে। ঠিক না?

ডাক্তার মুখ তুলে আস্তে আস্তে বললেন, হ্যাঁ, যুদ্ধ থেমে গিয়েছিল।

কুলদীপ বললো, বিউগলে যুদ্ধ বিরতির সুর শুনে আমি নেমে আসছিলাম পাহাড় থেকে...তারপর কি হঠাৎ গড়িয়ে পড়ে গেলাম? অ্যাকসিডেন্ট হলো?

ডাক্তার কুলদীপের চোখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বললেন, না, আপনার গুলি লেগেছিল।

'কুলদীপ সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে মাথা তোলার চেষ্টা করতেই ডাক্তার এবং নার্স দু'দিক থেকে চেপে ধরলো তাকে।

কুলদীপ বললো, যুদ্ধ থেমে গিয়েছিল। তবু গুলি লাগবে কী করে? না, না, তা হতে পারে না।

ডাক্তার বললেন, যুদ্ধ থেমে গিয়েছিল, তবু আপনার গায়ে গুলি লেগেছে, মোস্ট আনফরচুনেট অ্যাকসিডেন্ট।

কুলদীপ একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। ডাক্তারকে সে অবিশ্বাস করতে পারলো না। তারপর হঠাৎ রীতিমতন ক্রুদ্ধ স্বরে বলতে লাগলো, কোথায় গুলি লেগেছে? আপনারা কি আমাকে না জানিয়ে অপারেশন করেছেন? আমার পা

বাদ গেছে ?

ডাক্তার বললেন, না, না, আপনার কিছু বাদ যায়নি। গুলিটা শুধু বার করে নেওয়া হয়েছে।

কুলদীপ জিজ্ঞেস করলো, আমি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছি না কেন ? আমার দুটো হাত...হ্যাঁ, হাত দুটো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু পা, আমার পা নেই ?

নার্স কুলদীপের পায়ে হাত দিয়ে বললো, এই তো আপনার পা।

কিন্তু কুলদীপ সেই স্পর্শ বুঝতে পারলো না। পায়ে কোনো অনুভূতি নেই। সে তীব্র স্বরে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় ?

নার্স কম্বল সরিয়ে একটা একটা করে কুলদীপের পা তুলে দেখালো।

ডাক্তার বললেন, আপনার চমৎকার ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে।

কুলদীপ অভিমানের সুরে জিজ্ঞেস করলো, আমার কোথায় গুলি লেগেছে ?

ডাক্তার বললেন, স্পাইনাল কর্ডে।

এরপর কুলদীপের মা এবং গীতা দেখা করতে এলো। কুলদীপ এখন কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেলেও কথা বলতে চায় না। ওদের প্রশ্নের একটা দুটো উত্তর দেয়। তার মুখখানা ম্লান। এতদিন পর সে তার অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পেরেছে। বুলেটের আঘাত লেগেছে তার স্নায়ু কেন্দ্রে। সেইজন্যই হাত পা নাড়াচাড়ার ক্ষমতা তার নেই। তার অবস্থা প্রায় একটা জড় পদার্থের মতন।

একদিন সে গীতাকে জিজ্ঞেস করলো, রবি কোথায় ? রবি কেমন আছে ?

গীতা বললো, রবি ভালো আছে। তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে।

কুলদীপ বললো, রবির কোথায় গুলি লেগেছে ?

গীতা একটু ইতস্তত করে বললো, বুকে, ডান দিকে।

তারপরই সে কৃত্রিম উৎফুল্লতা দেখিয়ে আবার বললো, রবি তোমাকে দেখার জন্য ছটফট করছে। আর একটু সুস্থ হলেই তোমার এখানে আসবে।

কুলদীপ আর কিছু না বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

কুলদীপের মনে পড়ে গেল একটা ঘটনা। রবি আর কুলদীপ দু'জনেরই বয়েস তখন দশ-এগারো। কুলদীপের মাথায় পাগড়ি, রবির মাথায় একটা জরির টুপি। সিমলা শহর থেকে খানিকটা দূরে একটা পাহাড়ে দু'পাশে ছুটে ছুটে ওপরে উঠছে। দু'জনের নানারকম বুনো ফুলের সমারোহ, তার মধ্য দিয়ে ছুটছে দুই বালক। এক জায়গায় মস্ত বড় একটা পাথরকে ঘিরে দু'জনে লুকোচুরি খেলতে লাগলো।

একজন মধ্যবয়স্ক শিখ পাহাড়ের খানিকটা নীচের রাস্তায় ছুটতে ছুটতে

আসছে আর চিৎকার করছে, কুলদীপ। রবি। কোথায় গেলে? শিগগির নেমে এসো!

সেই ডাক শুনে এই বালক দুটি আরও মজা পেয়ে গেল। তারা একটা গাছের আড়ালে গিয়ে লুকোলো। পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে অন্য লোকটির ডাক, কুলদীপ, রবি।

॥ ৪ ॥

একটা হুইল চেয়ারে বসানো হয়েছে কুলদীপকে। একজন আর্দালি সেই চেয়ারটা ঠেলে ঠেলে নিয়ে গেল ক্যাবিন থেকে বারান্দায়।

কুলদীপ সেখান থেকে দেখতে লাগলো বাগান। বাইরে থেকে কিছু লোক অনবরত যাওয়া আসা করছে বাগানের মধ্য দিয়ে। কুলদীপ শুধু যেন অনেক জোড়া পায়ের স্পন্দন লক্ষ করছে লোভীর মতন।

সেই দিকে এগিয়ে এলো গীতা। তার কাঁধে ঝুলছে একটা ফ্লাস্ক। কাছে এসে সে বললো, কুলদীপ তোমাকে আজ খুব ফ্রেশ দেখাচ্ছে।

কুলদীপ একটু হাসলো।

পাশের চেয়ারে বসে গীতা বললো, তোমার জন্য ভালো চা এনেছি। এখানকার চা তোমার পছন্দ হয় না।

ফ্লাস্কের ঢাকনাতেই চা ঢেলে সে কুলদীপের দিকে এগিয়ে দিল। কুলদীপ হাত খুলে সেই কাপটা ধরলো।

গীতা তার ব্যাগ খুলে একটা বিস্কিটের প্যাকেট বার করে বললো, একটা বিস্কিট নেবে?

বিস্কিটের প্যাকেটটা একটু দূরে ধরে রইলো গীতা। কুলদীপ আস্তে আস্তে বাঁ হাতটা তুললো। হাতটা একটু একটু কাঁপছে। তবু সে একটা বিস্কিট নিতে পারলো। খুশিতে ঝলমলে হয়ে উঠলো গীতার মুখ। সে বললো, এই দ্যাখো, এখন দুটো হাতই তুমি ব্যবহার করতে পারছো।

একটা বাচ্চা ছেলে যেন স্কুলে ফার্স্ট হয়েছে, এরকম একটা লজ্জা মেশানো গর্ব ফুটে উঠলো কুলদীপের মুখে।

সেই রকম একটা বাচ্চাকেই উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে গীতা আবার বললো, এবার থেকে তুমি ছবি আঁকতেও পারবে। কাল আমি তোমার জন্য রং পেন্সিল আর কাগজ নিয়ে আসবো।

গীতার মুখের দিকে দু'এক পলক তাকিয়ে চায়ের কাপ আর বিস্কিট, দুটোই

ফেলে দিল কুলদীপ। তার দুর্বল হাত থেকে পড়ে গেল, না ইচ্ছে করে সে ফেলে দিল, তা বোঝা গেল না। তার মুখখানা এখন কঠিন

গীতা খানিকটা অপ্রস্তুত হলেও সান্ত্বনার সুরে বলে উঠলো, ঠিক আছে, ঠিক আছে, কিছু হয়নি। আস্তে আস্তে হাতে জোর আসছে আমি অন্য একটা কাপ আনছি।

গীতা চেয়ার ছেড়ে উঠতে যেতেই কুলদীপ তার একটা হাত চেপে ধরলো শক্ত করে শান্ত ভাবে বললো, শোনো, গীতা।

গীতা মুখ তুলে বললো, কী ?

কুলদীপ সোজাসুজি গীতার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার শরীর কাঁপছে। দণ্ডাজ্ঞার সুরে কুলদীপ বললো, তুমি কাল থেকে আর আমার কাছে এসো না !

গীতার সমস্ত মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে বললো, কী বলছো তুমি, কুলদীপ ? আমি আর আসবো না ?

কুলদীপ বললো, না। কেন আসবে ? দিনের পর দিন তুমি আমার কাছে এসে কেন এতটা সময় নষ্ট করবে ?

গীতা আহত ভাবে বললো, মোটেই আমি সময় নষ্ট করি না। তোমার কাছে আসার চেয়ে আর কোনো জরুরি কাজ আমার থাকতে পারে না।

কুলদীপ বললো, দিনের পর দিন হাসপাতালে আসতে কারুর ভালো লাগতে পারে ? চারদিকে শুধু অসুস্থ মানুষ।

গীতা এবার জোর দিয়ে বললো, আমি হাসপাতালে আসি না, কুলদীপ। আমি শুধু তোমার কাছে আসি। আমি অন্য কিছু দেখতে পাই না।

কুলদীপ বললো, ডিউটি দেবার মতন আমার কাছেও তোমাকে আর আসতে হবে না।

গীতা রাগ করে বলতে গেল, কি বললে, ডিউটি... মাঝপথে তার কথা থেমে গেল, চোখে এসে গেল জল।

একটুখানি নিজেকে সামলে নিয়ে গীতা আবার বললো, কেন, এই সব কথা বলছ ? প্লিজ আর কখনো বলো না।

কুলদীপ চুপ করে রইলো।

গীতা কুলদীপের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

গীতার বাড়িতেও একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে চার মাস কেটে গেছে, কুলদীপের অবস্থার তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। কোমরের তলা থেকে

তার শরীরের অর্ধেক সম্পূর্ণ অবশ। তা ছাড়া তার এখনো মাঝে মাঝেই জ্বর হয়। নিঃশ্বাসের কষ্ট হয়। গীতা প্রত্যেকদিন বিকেলের দিকে এসে তিন চার ঘণ্টা থাকে কুলদীপের কাছে। সে পড়াশুনোয় মন দিতে পারে না। সম্প্রতি লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে সে একটা স্কলারশিপ পেয়েছে, গীতার বাবা-মায়ের ইচ্ছে গীতার সেটা নেওয়া উচিত। কিন্তু গীতা এখন লন্ডনে চলে যেতে একেবারেই রাজি নয়। কুলদীপকে ছেড়ে সে যাবে না। সে কুলদীপের বাগদত্তা। কুলদীপ তার হাতে একদিন আংটি পরিয়ে দিয়েছিল। যুদ্ধটা না বাধলে এর মধ্যে তাদের বিয়ে হয়ে যেত। লন্ডনে যাবার ব্যাপার নিয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে রোজই গীতার কথা কাটাকাটি হচ্ছে। এরই মধ্যে কুলদীপের মুখ থেকে এরকম কথা শুনবে সে আশা করেনি।

চেষ্টা করে মন-খারাপটা ঝেড়ে ফেললো গীতা।

একজন লোক ডেকে এনে জায়গাটা মুছিয়ে দিল, তারপর সামনে একটা টুল পাতল। আর এক কাপ চা ঢেলে কুলদীপকে বললো, আমি চা বানিয়ে এনেছি, তুমি খাবে না ?

কুলদীপ এবার চায়ে চুমুক দিল।

গীতা তার কাঁধের ব্যাগ থেকে বার করলো একটা বেশ বড় বই। নতুন, ঝকঝকে। সেটা শুধু ছবির বই।

গীতা বইটা খুলে কুলদীপের সামনে মেলে ধরে বললো, এই দ্যাখো, এই বইটা আজই বেরিয়েছে। তোমাদের অভিযানের কত ছবি... মিঃ সারিন বইটা দিলেন আমাকে।

প্রথম পাতা জোড়া ছবিটাতে দেখা যাচ্ছে কুলদীপ, রবি আরও তিন-চারজনকে। তাদের মধ্যে আছে রাওয়াত, ফুদোরজি আর মোহন। ওরা দাঁড়িয়ে আছে নেপালের থিয়াংবোচে গ্রামের বিখ্যাত মনাস্টারির সামনে।

ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মানুষগুলো যেন নড়ে ওঠে। কুলদীপের মনে পড়ে যায় সেদিনের সব দৃশ্য।

এভারেস্ট অভিযানের পথে শেষ বড় জন-বসতি নামচে বাজার। তার কাছাকাছি তাঁবু ফেলা হয়েছে। সেখান থেকে কুলদীপ কয়েকজনের সঙ্গে থিয়াংবোচের মনাস্টারি দেখতে এসেছে। তার কাঁধে ক্যামেরা।

ওরা মনাস্টারির ভেতরে ঢুকলো। ভেতরটা প্রায় অন্ধকার, কয়েকটা প্রদীপ জ্বললেও প্রথমে কিছু চোখে দেখা যায় না। তারপর বিরাট বুদ্ধমূর্তি একটু একটু করে স্পষ্ট হয়। চতুর্দিকের দেওয়ালে আরও অসংখ্য মূর্তি। প্রচুর

পাণ্ডুলিপি।

ঘুরে দেখতে দেখতে ওদের চোখ গেল একদিকে। একটা উঁচু বেদির ওপর বসে আছেন এক বৃদ্ধ লামা। প্রথমটায় তাঁকেও একটা মূর্তি মনে হয়। ইনি চোখ বুজে আছেন। এর বয়েসের যেন গাছ-পাথর নেই।

কুলদীপ এবং অন্যরা এঁর সামনে বসে পড়লো।

অন্যদের দিকে তাকিয়ে রবি চোখের ইঙ্গিত করলো। অর্থাৎ সে লামাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চায়।

রবি প্রণাম জানিয়ে বললো, প্রভু, আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাহাড়ে উঠতে যাচ্ছি। আমরা সার্থক হবো তো?

বৃদ্ধ লামা কোনো উত্তর দিলেন না।

রবি প্রশ্নটা আবার উচ্চারণ করলো। বৃদ্ধ লামা চোখ মেলে ওদের দেখলেন। তারপর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সুর করে গেয়ে উঠলেন, ওঁম মণি পদ্মে হুঁ।

দ্বিতীয় ছবি।

আকাশের গায়ে কয়েকটি বরফ মাখা পাহাড়ের চূড়া।

নামচে বাজার ছাড়াবার পর প্রথম এখানে কুলদীপ এভারেস্টের শিখর দেখেছিল। পাশাপাশি চার-পাঁচটি শিখর, তার মধ্যে কোনটি এভারেস্ট তা চেনা শক্ত।

রবি আর রাওয়াত সেখানে দাঁড়িয়েছিল কুলদীপের পাশে। রবি জিজ্ঞেস করলো, বল তো, কোন্‌টা এভারেস্ট?

কুলদীপ বললো, নিশ্চয়ই সবচেয়ে ছোটটা। যেটা মাত্র একটুখানি দেখা যাচ্ছে।

রাওয়াত খানিকটা অবাক হয়ে বললো, ইউ আর রিয়েল স্মার্ট, কুলদীপ। অনেকেই এখানে দাঁড়িয়ে লোৎসে পীকটাকে এভারেস্ট মনে করে।

কুলদীপ বললো, (প্রথমেই যাকে বড় মনে হয়, অনেক সময় সে বড় হয় না।)

রবি বললো, আমরা অত দূরে যাবো? এখান থেকে যেন বিশ্বাসই করা যায় না।

রাওয়াত নিজের বুকে হাত রেখে বললো, দ্যাখো এভারেস্ট পীক দেখা মাত্র আমার বুকটা ধকধক করছে। আমি আগের একটা টিমে ছিলাম। সেবারে পারিনি।

রবি জিজ্ঞেস করলো, আগের বারের এভারেস্ট অভিযান সাকসেসফুল হলো না কেন ? কী কী অসুবিধে হয়েছিল ?

রাওয়াত বললো, কোনো অসুবিধেই খুব বড় নয়। আমাদের সঙ্গে সব কিছুই ছিল। কিন্তু আসল বাধা কোথায় জানো ? তোমরা শুনলে হয়তো বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমি নিজে অনুভব করেছি। মাউন্ট এভারেস্ট যেন জীবন্ত, তাঁর ইচ্ছে-অনিচ্ছে আছে। তিনি দয়া না করলে তুমি কিছুতেই সার্থক হতে পারবে না। ওই চূড়া এক এক সময় খুব শান্ত, আবার হঠাৎ হঠাৎ দারুণ নিষ্ঠুর, হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।

কুলদীপ বললো, মালোরিও এই কথা লিখেছিলেন...

তৃতীয় ছবি।

বেস ক্যাম্পে একটা তাঁবুর বাইরে পাঞ্জা লড়ছে রবি আর মোহন। দু'জনেই সমান সমান। তাদের ঘিরে উৎসুক হয়ে দেখছে অনেকে। একটু দূরে উনুনে রান্না চাপানো হয়েছে। একজন একটা কাগজের প্লেন বানিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে ওপরে। অভিযাত্রীদের অবসর বিনোদনের একটি দৃশ্য।

কুলদীপ তখন একটু দূরে গিয়ে ফুলের ছবি তুলছিল। পাহাড়ের বিভিন্ন উচ্চতায় যে নানা জাতের ফুল দেখা যায়, সে সেই সব ফুলের ছবি তুলে রাখছে। তার খুব ফুলের শখ। ক্যামেরা হাতে নিয়ে সে এক পাথর থেকে লাফ দিয়ে যাচ্ছে অন্য পাথরে।

পাঞ্জা লড়াইয়ের দর্শকদের তুমুল চিৎকার শুনে সে ফিরে তাকালো। তারপর চলে এল তাঁবুর কাছে।

দর্শকরা দু' দলে ভাগ হয়ে গেছে। একদল বলছে বাক আপ মোহন, অন্য দল বলছে, বাক আপ রবি ! দু'জনেরই মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে।

হঠাৎ মুখ তুলে রবি বললো, আই কুইট !

মোহন পর্যন্ত অবাক হয়ে গেল। অনেকেরই ধারণা ছিল, রবিই জিতবে। সবাই জিজ্ঞেস করলো, কী হলো ? কী হলো ?

রবি হাসিমুখে বললো, আমি হেরে গেছি।

রাওয়াত জিজ্ঞেস করলো, শেষ পর্যন্ত না লড়েই হার স্বীকার করবে কেন ?

রবি বললো, আমার জিততে ইচ্ছে করে না। জিতলে আমার লজ্জা করে।

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছবি।

আরোহণের বিভিন্ন দৃশ্য। আর গাছপালা নেই। ফুল নেই, পাখি নেই। শুধু বরফ। কুলদীপের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে ফু দোরজি। সে এই দলের সবচেয়ে

অভিজ্ঞ শেরপা। সে কুলদীপকে আগেকার অনেক অভিযানের গল্প শোনায়। কুলদীপ এর আগে বড় কোনো পাহাড়ে ওঠেনি, দার্জিলিং-এ তেনজিং-এর কাছে ট্রেইনিং নিয়েছে, সিকিমের দিকে কয়েকটা ছোট ছোট চূড়ায় ওঠার অভিযানে অংশ নিয়েছে। এই দলের মধ্যে তার অভিজ্ঞতা সবচেয়ে কম, কিন্তু সে হিমালয় অভিযান সম্পর্কে সমস্ত লেখা পড়েছে। সে ফু দোরজিকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি ইয়েতি দেখেছো ?

ফু দোরজি বললো, হ্যাঁ দেখেছি, দু' বার।

কুলদীপ বললো, সত্যি ? ছবি তোলনি কেন ? কেউ কি ছবি তুলতে পেরেছে ?

ফু দোরজি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললো, সাব, পাহাড়ে ওঠার সময় ওই নাম করতে নেই।

কুলদীপ হাসতে লাগলো।

সপ্তম ছবি।

নদী পার হওয়ার জন্য সাঁকো বসানো হচ্ছে। নদীর জলে ভাসছে বরফের চাঁই।

সবাই সাঁকো বানাতে ব্যস্ত। এর মধ্যে একটা হৈহৈ রব উঠলো। শেরপারা চ্যাঁচামেচি করে বলছে, ইয়েতি ! ইয়েতি ! দূরে দেখা গেল মানুষের মতন একটা মূর্তি সাঁ করে দৌড়ে লুকিয়েপড়লোএকটা বড় পাথরের আড়ালে।

অনেকে সেই দিকে ছুটলো।

কুলদীপ তাড়াতাড়ি তার ব্যাগ থেকে ক্যামেরাটা বার করে নিয়ে দৌড়লো পাথরটার দিকে।

মানুষ কিংবা বাঁদরের মতন একটা প্রাণী ঝুঁকে পড়ে ছুটছে, অন্যরা তাকে তাড়া করে যাচ্ছে, আর কুলদীপ মাঝে মাঝে থেমে ছবি তুলছে। বুকখানা ধক ধক করছে তার। সত্যি ইয়েতি ? পৃথিবীতে আগে কেউ ইয়েতির ছবি তুলতে পারেনি। এরা নাকি হঠাৎ হঠাৎ চোখের সামনেই অদৃশ্য হয়ে যায় ?

এত লোকের নজর এড়িয়ে ইয়েতিটা পালাবে কী করে ? পরিষ্কার দিনের আলো। ধরা পড়তে দেখা গেল সে একজন মানুষ, গায়ে শতচ্ছিন্ন কোট, মুখভর্তি দাড়ি, পায়ে জুতো নেই, ন্যাকড়া জড়ানো।

কুলদীপ ক্যামেরা নিয়ে একেবারে সামনে এসে পড়ে হতাশভাবে বললো, মানুষ।

লোকটির হাতে একটা পাঁউরুটি। সেটা সে বুকে চেপে ধরে আছে। তার

চোখে অসম্ভব ভীতি। অন্যদের কোনো প্রশ্নের সে উত্তর দিচ্ছে না।

একজন বললো, এ তো মনে হচ্ছে একটা পাগল।

অন একজন বললো, পাগল নয়, চোর। আমাদের রুটি চুরি করেছে।

মোহন বললো, চোদ্দ হাজার ফিট উঁচুতেও চোর?

রাওয়াত গম্ভীরভাবে বললো, চোর নয়। এখানকার মানুষ চোর হয় না। ওই রুটিটা খারাপ হয়ে গেছে বলে আমরা ফেলে দিয়েছিলাম। আমি আগের বারও দেখেছি, অভিযাত্রীরা যেসব জিনিস ফেলে দিয়ে যায়, কিছু কিছু লোক সেগুলো কুড়োবার জন্য পিছু পিছু আসে।

মোহন বললো, ভিখিরি! হিমালয়েও ভিখিরি।

রাওয়াত বললো, খিদের জন্য মানুষ কোথায় না যেতে পারে!

রবি বললো, আবার মানুষই পারে খিদে জয় করতে। ঐ দ্যাখো।

একটু দূরে একটা গুহার কাছে পদ্মাসনে বসে ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে আছেন এক সন্ন্যাসী। কোনো দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। চক্ষু দুটি বোজা।

ওরা কয়েকজন এগিয়ে গিয়ে সেই সাধুর সামনে প্রণাম জানালো। কুলদীপ তুলতে লাগলো একের পর এক ছবি। সাধু কিছুই গ্রাহ্য করলেন না, একবারও চোখ মেলে দেখলেন না।

অষ্টম ছবি।

রবি কুলদীপকে একটা দুরন্ত চড়াইতে উঠতে সাহায্য করছে। দড়ির এক প্রান্তে ঝুলছে কুলদীপ, অন্য প্রান্ত ধরে আছে রবি। প্রাণপণ শক্তিতে দড়িটা টেনে তোলার সময় রবির চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। এই ছবিটার একপাশে গীতার হাতের আঙুল। পাশে কুলদীপ তার হাত রাখলো। গীতা কুলদীপের আঙুল নিয়ে খেলা করতে লাগলো।

পরের ছবি। ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্য দিয়ে উঠে যাচ্ছে কয়েকজন অভিযাত্রী। এই দলে কুলদীপ নেই। অন্য আর পাঁচজনের সঙ্গে রয়েছে রবি। সকলের মুখ গম্ভীর। হঠাৎ রবি একটু এগিয়ে গিয়ে অন্যদের দিকে মুখ করে লাফিয়ে লাফিয়ে একটা গান গাইতে লাগলো। দলের সকলের মনে রবি এই ভাবে উৎসাহ জোগাল।

পনেরো হাজার ফিটের পর নিঃশ্বাস ফেলতে হয় মেপে মেপে। জোরে জোরে কথা বললে কিংবা গান গাইলে দম খরচ হয়ে যায়। কিন্তু রবি অদম্য।

পরের ছবির পাতা ওল্টাতেই একজন অ্যাটেন্ডান্ট এসে দাঁড়ালো পাশে। লোকটি ছবি দেখার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঁকি মারলো। কিন্তু অন্য কারুর

উপস্থিতিতে এই সব ছবি দেখতে চায় না গীতা। সে বইটা বন্ধ করে তাকালো লোকটির দিকে।

লোকটি বললো, এবার ক্যাবিনে যেতে হবে। লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে।

গীতা কুলদীপকে জিজ্ঞেস করলো, বাকিটা তাহলে বিকেলবেলা দেখাবো ?

কুলদীপ লোকটির দিকে তাকিয়ে বললো, একটু পরে যাবো !

লোকটি চলে যাবার পর গীতা বললো, তুমি নিজেও তো অনেক ছবি তুলেছো, মুভিও তুলেছিলে কিছু, সেসব প্রিন্ট করা হয়েছে ?

কুলদীপ উত্তর না দিয়ে ফ্যাকাসে ভাবে হাসলো।

তারপর নিজেই সে একটা পাতা ওল্টালো।

এই ছবিতে আর পাথর, কিংবা সামান্য লতাগুল্মও দেখা যায় না। বরফ, শুধু বরফ।

পৃথিবী এখানে ধবল বর্ণ।

শুধু সাদা রঙের নিস্তব্ধতা। চতুর্দিকেই হিমালয়। এক একটা শিখর ছুঁয়ে আছে আকাশ। এখানে আকাশও দেখা যায় না। আকাশের রংও সাদা।

এই বরফের মধ্যে দূরে একটা কালো বিন্দু।

সেই বিন্দুটা নড়াচড়া করে উঠলো। ছবিটা বিশাল হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বোঝা যায়, সেই বিন্দুটা একজন মানুষ। সে একা একা চলেছে। আরও কাছে এলে চেনা যায়। সে কুলদীপ।

কুলদীপের এক হাতে আইস অ্যাক্স। অন্য হাতে ক্যামেরা। পিঠে বাঁধা অক্সিজেন সিলিন্ডার। সে ধীর পায়ে হাঁটছে। বরফের মধে গেঁথে গেঁথে পা ফেলছে।

গীতা জিজ্ঞেস করলো, এখানেই তুমি হারিয়ে গিয়েছিলে ?

কুলদীপ কোনো উত্তর দিল না।

ছবির মধ্যে ঝড় উঠলো। সাঙ্ঘাতিক তুষার ঝড়। অন্ধ করে দেবার মতন ঝড়।

কুলদীপ মাতালের মতন টলতে টলতে এগোচ্ছে। দু তিন পা অন্তর অন্তর আছাড় খেয়ে পড়ছে, উঠে দাঁড়াচ্ছে আবার। একবার সে পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারলো না, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তুষারে তার সারা শরীর ঢাকা পড়ে গেল। তবু প্রবল মনের জোরের সে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো একটু বাদে, সারা গা থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলো, কিন্তু ঝাড়া যায় না, সব বরফ সেঁটে থাকে পোশাকের মধ্যে। দারুণ ভারী শরীর নিয়ে সে একটা

জীবন্ত পাথরের মূর্তির মতন পা ফেলতে লাগলো এদিকে ওদিকে।

হঠাৎ ঝড়ের রং মিশমিশে কালো হয়ে গেল, কুলদীপকে আর দেখা গেল না।

অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পে তখন বিকেল। রাওয়াত, বোগি, রবি, ফু দোরজি বসে আছে তাঁবুর মধ্যে। দানু তাদের হাতে দিল গরম কফির কাপ। প্রত্যেকে কাপ নিয়ে আগে গালে ঠেকালো, ঠাণ্ডা গাল একটু গরম করার জন্য।

রবি বললো, আজ পনেরোই মে। এই সময় দিল্লিতে এখন কতটা গরম?

রাওয়াত দাঁতের খটখটানি থামাতে পারছে না। অন্য সবাই হেসে উঠলো। এই সময় দিল্লির বাতাসে আগুনের হল্কা।

রবি বললো, গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত এই সব ঋতুগুলো এখানে একেবারেই অবাস্তব, তাই না? এখানে শুধু চির-শীত।

বাইরে ঝড়ের শাঁ শাঁ শব্দ। হেলে পড়ছে তাঁবু। রবি দু চুমুকে কফি শেষ করে বললো দানু, পৃথিবীতে তোমার মতন কফি বানাতে আর কেউ পারে না। এত ভালো কফি আগে কখনো খাইনি। আর এক কাপ দেবে।

বোগি বললো, র‍্যাশন! র‍্যাশন! এক কাপের বেশি না।

রবি কাকুতি মিনতি করে বললো, প্লিজ! আর এক কাপ না খেলে চলবেই না!

দানু কফির পটটা এনে রবির কাপের ওপর উপুড় করলো। পড়লো মাত্র কয়েক ফোঁটা।

রবি বললো, দূর শালা!

বোগি বললো, আর দু ঘন্টা পরে গরম গরম সুপ পাবে।

রবি বললো, তা হলে আমি এখন আমার কোটা থেকে ব্র্যান্ডি খাবো।

রাওয়াত আর বোগি দু জনেই ব্যস্ত হয়ে বললো, নো, রবি, ডোন্ট! এখন ব্র্যান্ডি খেলে ব্লাড প্রেসার ফ্ল্যাকচুয়েট করবে।

রবি বললো, আমার কিছু হবে না। ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে আঙুলগুলো।

রাওয়াত বললো, রবি, এত হাই অলটিচিউডে অ্যালকোহল শরীরের পক্ষে মোটেই ভালো নয়।

রবি তবু বেপরোয়া ভঙ্গিতে বললো, বলছি তো আমার কিছু হবে না। আমি আর ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারছি না। আজ যেন হাড় পর্যন্ত হিম হয়ে যাচ্ছে।

রবি তার ব্র্যান্ডির বোতল খুঁজতে লাগলো, এই সময় শব্দ করে উঠলো রাওয়াতের পাশে রাখা ওয়াকি টকি।

রাওয়াত সেটা তুলে কথা বলতে লাগলো তিন নম্বর ক্যাম্পের সঙ্গে।

দলের নেতা মোহন সেখান থেকে অন্য খবরাখবর নিতে নিতে এক সময় জিজ্ঞেস করলো, কুলদীপ কখন পৌঁছোলো? একবার কুলদীপকে দাও, কথা বলবো।

রাওয়াত বললো, কুলদীপ? কুলদীপ কোথায়? আজ রাতটা ক্যাম্প থ্রিতেই তো তোর থাকার কথা। অক্সিজেন সিলিন্ডারটা সারিয়ে নিয়ে কাল সকালে...

মোহন বললো, অক্সিজেন সিলিন্ডারটা সারিয়ে ফেলে কুলদীপ দুপুরবেলাই তো রওনা হয়ে গেল। অনেকক্ষণ গেছে, এর মধ্যে তার পৌঁছে যাওয়ার কথা।

বোগি বললো, কুলদীপ এই ঝড়ের মধ্যে একলা আসবার চেষ্টা করছে? ব্লাডি ফুল!

রাওয়াত বললো, দুপুরে আকাশ খুব ক্লিয়ার ছিল। রোদ উঠলে ও ছবি তোলার লোভ সামলাতে পারে না।

দানু চিন্তিত ভাবে বললো, এই ঝড়ের মধ্যে ....

রবি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, লেটস গো!

বোগি বললো, ঝড়টা একটু থামুক। এর মধ্যে বেরুলে কিছু দেখতে পারবো না। আমরাও বিপদে পড়ে যাবো।

রবি একবার ফু দোরজির দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে।

ফু দোরজি আর অন্যরাও বেরিয়ে এলো।

রাওয়াত আদেশের সুরে বললো, রবি, দাঁড়াও, হঠকারিতা কোরো না।

রবি বললো, তোমরা থাকো। আমি যাচ্ছি। আমাকে যেতেই হবে।

তারপর অদ্ভুত ভাবে হেসে সে বললো, আই হ্যাভ আ চার্মড লাইফ। আমার কোনো বিপদ হবে না।

তারপরই সে দৌড়োতে শুরু করলো।

ফু দোরজি বললো, সাব, ঝড় এবার কমবে। নর্থ সাইডটা দেখুন, ক্লিয়ার হয়ে আসছে।

বোগি বললো, রোপ নিয়ে নাও।

ফু দোরজি বললো, লাগবে না।

এবার সবাই এগোলো এক সার বেঁধে। একজন কেউ পড়ে গেলে অন্যরা যাতে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলতে পারে। ঝড়টা সত্যিই কমে আসছে খুব তাড়াতাড়ি। মাঝে মাঝে একটু দূরে ছায়ামূর্তির মতন দেখা যাচ্ছে রবিকে।

রাওয়াত একটা মুখভঙ্গি করে বলে উঠলো, রবিটা একটা পাগল।

এই সার্চ পার্টিকে বেশি দূর যেতে হলো না।

মিনিট দশেক পরেই রবি এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে গেল রাওয়াতরাও পৌঁছে গেল তার পাশে।

গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে রবি বলে উঠলো, হোয়াট ইন হেল ইজ হি ডুয়িং দেয়ার ?

কুলদীপকে কী অবস্থায় দেখতে পাওয়া যাবে, তা নিয়ে সকলেরই মনে একটা আশঙ্কা ছিল। তুষার ঝড়ের মধ্যে দিকশূন্য ভাবে হাঁটতে গিয়ে ক্রিভাস-এর মধ্যে পড়ে যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকে। কেউ কেউ একেবারেই হারিয়ে যায় বরফের স্তূপের তলায়।

কিন্তু একটু দূরেই দেখা যাচ্ছে কুলদীপ দিব্যি সুস্থ শরীরেই রয়েছে। কিন্তু একটা অদ্ভুত কাণ্ড করছে সে। হাঁটু গেড়ে বসে সে অ্যাক্সটা দিয়ে বরফ খুঁড়ে চলেছে।

রবি ডাকলো, কুলদীপ ! কুলদীপ !

কুলদীপ সে ডাক শুনতে পেল না। এদিকে তাকাচ্ছেও না।

রাওয়াত বললো, এই দারুণ ব্লিজার্ডের মধ্যেও ওর কোনো বিপদ হলো না। ছেলেটার অদ্ভুত ভাইটালিটি আর অদ্ভুত লাক।

রবি যখন কুলদীপের একেবারে কাছে পৌঁছে গেছে, তখনও কুলদীপ তার উপস্থিতি টের পেল না। সে খোঁড়াখুঁড়িতে ব্যস্ত।

রবি এবার তার কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, এই কুলদীপ, কী করছিস কী ! আমরা তোর জন্য...

কুলদীপ মুখ ফিরিয়ে একটা হাসি দিয়ে বললো, রবি এসেছিস ? দ্যাখ আমি কত হিডন অ্যাসেট পেয়ে গেছি। গুপ্তধন ! গুপ্তধন !

কুলদীপের পাশে রয়েছে কয়েকটা টিনের খাবার। চকোলেট বার, দু প্যাকেট হ্যাম, দুটো অক্সিজেন সিলিণ্ডার।

আগের কোনো অভিযাত্রী দল এসব ফেলে গেছে। সাউথ কলের অনেক জায়গাতেই এমন সব জিনিসপত্র ছড়ানো থাকে। ঠাণ্ডার জন্য— খাবারগুলো নষ্ট হয় না।

রাওয়াত বললো, বাঃ, আমাদের খাবারের স্টক বেড়ে গেল।

রবি একটা টিনের কৌটো তুলে নিয়ে লেবেলটা দেখে নিয়ে শিশ দিয়ে বলে উঠলো, চিকেন সুপ।

বোগি একটা চকোলেট বারের রাংতা খুলে ফেলে এক কামড় দিয়ে বলে উঠলো, হুঁ ! বেলজিয়ান চকোলেট !

কুলদীপ বললো, আসল জিনিসটা তোমরা দেখলে না ? এই অক্সিজেন সিলিণ্ডারটা ভর্তি আছে, ঠিক ঠাক কাজও করছে। আমি অন্য জিনিসগুলো আগে দেখিনি। এখানটায় হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে কী যেন একটা শক্ত জিনিসে মাথা ঠুকে গেল। এই সিলিণ্ডারটা খানিকটা উঁচু হয়ে ছিল। তখন এটা খুঁড়ে বার করতে গিয়ে দেখলাম, আরও অনেক জিনিসপত্র রয়েছে।

রবি বললো, একটা এক্সট্রা অক্সিজেন সিলিণ্ডার ... এটা তো একটা দারুণ জিনিস পেয়েছিস রে !

রাওয়াত বললো, সত্যি এটা খুব কাজে লাগবে। ঠিক আছে, এবার উঠে পড়ো, কুলদীপ। আর খুঁড়তে হবে না, যা পেয়েছো যথেষ্ট হয়েছে। সন্ধে হয়ে আসছে, এবার ক্যাম্পে চলো।

কুলদীপ বললো, আর একটু দেখা যাক। যদি আর একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার পাওয়া যায়। মনে হচ্ছে, এই জিনিসগুলো কোনো একটা অ্যামেরিকান টিমের। ওরা নামবার সময় কিছু ফেরত নিয়ে যায় না।

রাওয়াত বললো, বেশি লোভ করতে নেই। অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।

কুলদীপ বললো, আমার কুড়ুলে একটা শক্ত কিছুর সঙ্গে ঠোকা লাগছে। অনেকটা বরফের নীচে।

ফু দোরজি আর রবি বসে গেল কুলদীপের পাশে। ওরা খুঁড়তে খুঁড়তে আরও দু তিনটে খাবারের টিন পেয়ে গেল।

ফুল দোরজি অনেকটা গভীর থেকে বরফের চাঙাড়ের সঙ্গে কিছু একটা শক্ত জিনিস তুলে আনলো। একটু পরিষ্কার করতেই দেখা গেল সেটা একটা মানুষের মাথা। বহুকাল আগে মৃত কোনো অভিযাত্রীর।

ওরা স্তব্ধ হয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

পরের ছবি।

দুধারে দুই পাহাড়ের মাঝখানের গিরিখাদ দিয়ে পার হচ্ছে অভিযাত্রী দল। আকাশে মেঘের গুরু গুরু, চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ। হঠাৎ প্রচণ্ড বজ্রপাতের শব্দ হলো।

রবি আকাশের দিকে মুখ তুলে বললো, মেঘের গর্জন কী বলছে বল তো ?

কুলদীপ কোনো উত্তর দিল না।

রবি বললো, দ, দ, দ। দত্ত, দাম্যত, দয়ধ্বম !

তারপর সে আবৃত্তি করতে শুরু করলো টি এস এলিয়টের কবিতা,

Ganga was sunken, and the limp leaves
waited for rain, while the black clouds
Gathered far distant, over Himavant
The jungle crouched, humped in silence.
Then spoke the thunder
Da
Datta : what have you given....

পরের ছবি। একলা একজন অভিযাত্রী মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে বরফের মধ্যে।

কুলদীপ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চতুর্দিকে চেয়ে দেখলো। আর কারুকে দেখা যাচ্ছে না। যেন পৃথিবীতে সে সম্পূর্ণ একা। কোনটা সামনের দিক, কোনটা পেছনের দিক তাও বোঝা যায় না।

কুলদীপ বরফের মধ্যে অগ্রবর্তীদের পায়ের ছাপ খোঁজার চেষ্টা করলো।

হঠাৎ যেন ম্যাজিকের মতন সেই বরফের দেশে দেখা গেল কুলদীপের মা আর গীতাকে। গীতার পরনে টকটকে লাল রঙের শাড়ি, কুলদীপের মা পরে আছেন তুঁতে রঙের শালোয়ার-কামিজ। দুজনে একেবারে বিপরীত দিকে। দুজনে এমন ভাবে হাত তুলে রয়েছেন যেন বলতে চান, এই দিকে এই দিকে।। মা ও প্রেমিকার কণ্ঠ ডাকছে, কুলদীপ, কুলদীপ। কুলদীপ! চতুর্দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো সেই ডাক। দুই বিপরীত দিকের ডাকে কুলদীপ দিশেহারা।

পরের ছবি। শুধু পাশাপাশি কয়েকটি তাঁবু।

পঁচিশ হাজার ফিট উঁচুতে ক্যাম্প ফোর। আলাদা ছোট ছোট তাঁবু। তার মধ্যে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে শুয়ে রয়েছে অভিযাত্রীরা। বাইরে ঝোড়ো হাওয়া। নিজের তাঁবু থেকে পাশের তাঁবুতে অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছে কুলদীপ, বিশেষ কিছু শোনা যাচ্ছে না।

ফু দোরজি এরই মধ্যে একটা গুহা থেকে নীলচে রঙের বরফ ভেঙে নিয়ে এলো। একটা স্টোভের মধ্যে ডেকচি চাপিয়ে তার মধ্যে ফেললো সেই বরফ। বরফ গলিয়ে পানীয় জল হবে।

জল ফুটছে। ফু দোরজি পাশা খেলার মতন দুটো কাঠের চাক্তি মাটিতে ফেলে চোখ বুজে তুলছে তার একটা। তাতে লেখা, NO.

পরপর তিনবার সে চোখ বুজে চাক্তি তুললো। তিনবারই No.

সে খানিকটা ফুটন্ত জল চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেললো চায়ের মতন। তারপর কুলদীপের তাঁবুতে মুখ বাড়িয়ে বললো, সাব, এবার হলো না। আবার নেক্সট টাইম। এবার ফিরে চলো।

কুলদীপ বললো, কেন, এবার হবে না কেন?

ফু দোরজি বললো, আকাশের অবস্থা দেখছো না? দেবতারা চাইছেন না, এবার আমরা পীক ক্লাইম্ব করি।

কুলদীপ জিজ্ঞেস করলো, তুমি দেবতাদের মনের কথা কী করে জানলে?

ফু দোরজি জোর দিয়ে বললো, আমি জানি। আমি জানি।

কুলদীপ বললো, আমাকেও একজন দেবতা কী বলেছেন জানো? শুনবে? আরও কাছে এসো।

ফু দোরজি মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিলে কুলদীপ তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, Now or Never.

পরদিন আকাশ অনেক পরিষ্কার হয়ে এলো।

ভোরবেলা পুরো দস্তুর পোশাক পরে নিয়ে বাইরে এসে ছবি তুলতে লাগলো কুলদীপ। এখান থেকে মাকালু, লোৎসে, নুপৎসে, আর কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। এবং পৃথিবীর চূড়া এভারেস্ট।

রবি তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসতেই কুলদীপ তার ক্যামেরা সেদিকে ফেরালো। রবি দুবার লাফ দিয়ে নিজেকে চাঙ্গা করে নিতে চাইলো। তার মুখখানি আড়ষ্ট।

এখান থেকে মাত্র চারজন একেবারে চূড়ায় ওঠার চেষ্টা করবে। দুজন দুজন দড়ি বেঁধে। বাকিরা বিদায় নেবে।

রাওয়াত আর ফু দোরজি নিজেদের জুড়ে দড়ি বাঁধলো। রবির সঙ্গে কুলদীপ। দুই আবাল্য বন্ধু একসঙ্গে যাবে জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিযানে।

শুরু হলো যাত্রা।

রাওয়াত আর ফু দোরজি এগিয়ে গেল। কুলদীপ মাঝে মাঝেই ছবি তুলছে বলে একটু একটু থেমে যাচ্ছে। রবি কোনো কথা বলছে না। তার মুখখানা কুঁকড়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে, সে দু হাতে শরীর চুলকোচ্ছে।

কুলদীপ প্রথমে ব্যাপারটা লক্ষ করেনি। ক্রমশ বাতাসের গতিবেগ অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় ছবি তোলা অসম্ভব হয়ে উঠলো। সামনেই রেজর্স এজ। এককালে বহু অভিযাত্রী এই পর্যন্ত এসে ফিরে গেছে।

অভিযান শুরু করার আগে শেষের কয়েক হাজার ফিটের প্রতিটি অংশের বিবরণ আর ম্যাপ মুখস্ত করেছে ওরা সবাই। রবি কুলদীপের তুলনায় অনেক বেশি পড়ুয়া। এরিক শিপটনের মতন আগেকার অভিযাত্রীদের বিবরণ তার কণ্ঠস্থ তো বটেই, তা ছাড়াও সে উদ্ধৃতি দিতে পারে অনেক সাহিত্য থেকে। সে পড়েছে 'রেজর্স এজ' নামে সামারসেট মমের উপন্যাস। উপনিষদের শ্লোক, ক্ষুরস্য ধারা নিশিতয়া ...। সশরীরে সেই জায়গায় এসেও রবি কোনো কথা বলছে না কেন ?

ক্যামেরা গুটিয়ে ব্যাগে ভরে কুলদীপ ডাকলো, রবি, রবি।

রবি প্রায় একশো ফিট পিছিয়ে আছে। ডাক শুনেই যেন সে মাটিতে শুয়ে পড়লো। মুণ্ডু কাটা পাঁঠার মতন ছটফট করতে লাগলো একটা বিপজ্জনক খাদের পাশে।

কুলদীপ আঁতকে উঠলো কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও ছুটে যাওয়া যায় না। বাতাসের গতি ঘন্টায় ষাট-সত্তর কিলোমিটার, শূন্যের নীচে তিরিশ ডিগ্রি শীত সমস্ত পোশাকের নীচে কাঁপিয়ে দিচ্ছে হাড়মজ্জা। তার মধ্যেও প্রতিটি পদক্ষেপ মেপে ফেলতে হয়। হুড়োহুড়ি করলেই অবধারিত মৃত্যু।

রবির সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা বিপর্যয় হয়েছে বুঝেও কুলদীপ ফিরতে লাগলো। একবার পা পিছলোলেই দশ হাজার ফিট নীচে তিব্বতে পৌঁছোবে তার চূর্ণ বিচূর্ণ শরীর।

কোনোক্রমে কাছে এসে কুলদীপ বললো, কি হয়েছে। রবি, ওঠ। আমি ধরছি।

রবি হাঁপাতে হাঁপাতেও হেসে বললো, আমার দম ফুরিয়ে গেছে। আই কুইট।

কুলদীপ এর আগেও রবিকে গা চুলকোতে দেখেছে কয়েকবার। নিশ্বাস ফেলছে হাঁপরের মতন। সে বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করলেই রবি বলেছে, তোদের ভয় দেখাচ্ছি। এই দ্যাখ, এখন আমি নরম্যাল।

পরের মুহূর্তে রবি সত্যিই স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

কুলদীপের আফশোস হলো কেন সে তখন ব্যাপারটাতে গুরুত্ব দেয়নি। খুব বেশি ঠাণ্ডায় কারুর কারুর এরকম অদ্ভুত অ্যালার্জি হয়, সারা শরীর চুলকোয়। কারুর হার্টে সামান্য গোলমাল থাকলে হাই অলটিচিউড আর অত্যধিক ঠাণ্ডায় হঠাৎ তা বেড়ে যায়।

কুলদীপ রবির অক্সিজেন সিলিণ্ডারটা চেক করলো। প্রতি মিনিটে দু লিটার

সেট করা আছে। কুলদীপ আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে বললো এবার কি রকম বোধ করছিস।

রবির চোখ দুটো উল্টে যাচ্ছিল। কয়েকবার কথা বলার চেষ্টা করেও পারলো না। চুলকুনির জ্বালায় সে পোশাক খুলে ফেলার চেষ্টা করছে।

কুলদীপ জিজ্ঞেস করলো, তোর সঙ্গে কোনো ওষুধ নেই?

রবি দু দিকে মাথা ঝাঁকালো।

কুলদীপের এ পর্যন্ত শরীর নিয়ে কোনো সমস্যাই হয়নি। বন্ধুরা বলে কুলদীপের শরীরটা ইস্পাত দিয়ে তৈরি। তার হাত পায়ের গড়ন নিখুঁত। চওড়া বুক, সরু কোমর, তার রিফ্লেক্স অসাধারণ। কতবার আলগা পাথরে পা দিয়ে গড়িয়ে পড়তে গিয়েও সে বেঁচে গেছে। অ্যাডভ্যান্স বেস ক্যাম্পে তার তাঁবুর পেছনে একটা বোল্ডারে দাঁড়াতে গিয়েই সেটা গড়াতে লাগলো। কুলদীপের হাতে তখন মুভি ক্যামেরা, ঝাঁপ দিয়ে নামতে গেলে ক্যামেরাটায় চোট লাগবে। বোল্ডারটা রীতিমতন বেগে নামছে নীচের দিকে, তার ওপর ব্যালান্স করে দাঁড়িয়ে ছিল কুলদীপ। ওপর থেকে চেঁচাচ্ছিল বন্ধুরা। প্রাণ বাঁচাবার জন্য তার তখন ক্যামেরাটার মায়া ত্যাগ করা উচিত, তবু কুলদীপ সেটা ফেলে দেয়নি। বোল্ডারটা একটু সমতলে আসতেই সে শূন্যে অনেকখানি লাফিয়ে উঠে পড়েছিল নরম বরফের ওপর। বন্ধুরা পরে বলেছিল সেই সময় কুলদীপকে দেখাচ্ছিল বিখ্যাত নর্তক নুরিয়েভের মতন।

শরীর নিয়ে কখনো চিন্তা করতে হয়নি বলেই কুলদীপ সঙ্গে কোনো ওষুধপত্র রাখে না। রবিরও স্বাস্থ্য খুব ভালো, কিন্তু তার যে এমন অ্যালার্জি আছে তা কে জানতো। হয়তো রবি নিজে জানতো কিন্তু এতদিন গোপন করেছে।

কুলদীপ খানিকটা অসহায় বোধ করলো। তাদের দলের ডাক্তার এসেছে ক্যাম্প থ্রি পর্যন্ত, সেই পর্যন্ত না নামলে রবির চিকিৎসা হবে না। চুলকানির জ্বালায় রবি যেভাবে পোশাক খুলে ফেলতে চাইছে, তাতে নির্ঘাত ওর ফ্রস্ট বাইট হবে।

ওর হাত চেপে ধরে কুলদীপ ব্যাকুল ভাবে বললো, রবি, রবি, রবি!

রবি ঘোলাটে দৃষ্টিতে চাইলো কুলদীপের দিকে। যেন সে মানুষ চিনতে পারছে না। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই তার চোখ স্বাভাবিক হয়ে এলো। চুলকানি বন্ধ করে সে উঠে বসলো। অদ্ভুত একটা ঘড়ঘড়ে গলায় সে বললো, তুই এগিয়ে যা কুলদীপ, দ্যাখ, ওরা কোথায় গেল?

কুলদীপ খানিকটা আশান্বিত হয়ে বললো, তোর জ্বালা কমেছে ?

নিজের শরীর থেকে দড়ির বাঁধন খুলতে খুলতে রবি বললো, আমার বুকে ব্যথা করছে। আমি আর পারবো না।

কুলদীপ বললো, ঠিক আছে, আজ আমরা নেমে যাই, আবার কাল ফাইনাল অ্যাসল্টে আসবো।

রবি বললো, আজ আকাশ পরিষ্কার, রোদ উঠেছে। আজকের মতন দিন যদি আর না আসে ? আমার বুক ব্যথা, এর থেকে উঁচুতে উঠতে গেলে আমি কোলাপস করে যাবো।

কুলদীপ সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলো রাওয়াত আর ফু দোরজি কোথায় মিলিয়ে গেছে !

মন ঠিক করে ফেললো কুলদীপ। সেও যাবে না। রবিই তাকে পর্বত অভিযানের প্রেরণা দিয়েছে, রবির জন্যই সে এই টিমে সুযোগ পেয়েছে। এত কাছাকাছি এসে এভারেস্ট জয় করার দুর্লভ সম্মান সে রবিকে বাদ দিয়ে একা অর্জন করবে কী করে ?

রবিকে তুলে দাঁড় করিয়ে তার একটা হাত নিজের কাঁধে রেখে কুলদীপ বললো, আমাকে ধরে থাক, আমরা আস্তে আস্তে নীচে নামবো।

নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে রবি হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, না, তুই নামবি না। তোকে ওপরে উঠতে হবে।

কুলদীপ দৃঢ় স্বরে বললো, তোর এক্ষুনি ট্রিটমেন্ট দরকার। আমরা একসঙ্গে গেলে তাড়াতাড়ি হবে।

রবি আবার নিজের শরীর চুলকোতে চুলকোতে বললো, আই ক্যান টেক কেয়ার অব মাইসেলফ। তুই দেরি করিস না, তা হলে রাওয়াত আর ফু দোরজিকে হারিয়ে ফেলবি।

কুলদীপ বললো, রবি, তুই ভালো করেই জানিস, তোকে এখানে একা ফেলে আমি ওপরে যাবো না। চল, শুধু শুধু দেরি করিস কেন !

রবি বললো, ডোনট বি আ সেন্টিমেন্টাল ফুল ! এত কাছে এসেও কেউ এভারেস্ট জয় করার সুযোগ ছাড়ে ! তুই যা ! নেমে যাওয়াটা শক্ত কিছু না, আমি ঠিক ফিরতে পারবো।

কুলদীপ বললো, এবার না হয় নাই-ই হলো। এর পরের কোনো অভিযানে আমরা দুজনে আবার আসবো।

রবি ডান হাতটা নিজের বুকে ঘষতে লাগলো খুব জোরে জোরে। তার

নিশ্বাস আটকে আছে।

হঠাৎ থেমে গিয়ে সে ধীর শান্ত গলায় বললো, আমি কোনো কিছুতেই শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারি না। অ্যাই অ্যাম আ বর্ন লুজার। তুই যা কুলদীপ, তুই সাকসেসফুল হলে সেটাই হবে আমারও সাকসেস।

কুলদীপকে আর উত্তর দেবার সুযোগও সে দিল না। হঠাৎ এক দৌড়ে সে হুড়মুড়িয়ে নেমে গেল। অত্যন্ত বিপজ্জনক ভাবে, তার পা টলছে, তবু দ্রুত সে নামছে নীচে।

কুলদীপ বিমর্ষ মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। সে বুঝেছে রবি এখন কিছুতেই তার সাহায্য নেবে না।

তারপর সে এভারেস্টের চূড়ার দিকে তাকালো। এত বড় চ্যালেঞ্জকে অস্বীকার করা যায় না। এ পর্যন্ত বিদেশিরা কয়েকবার ঐ চূড়া জয় করলেও কোনো ভারতীয় টিম শেষ পর্যন্ত উঠতে পারেনি।

রাওয়াত আর ফু দোরজিকে দেখা যাচ্ছে না। একা সে উঠবে কী করে? যে কোনো মুহূর্তে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলেই দুজন দুজন করে দড়ি বেঁধে উঠতে হয় শেষ আড়াই হাজার ফিট। একা ওঠা খুবই বিপজ্জনক।

সবাই বলে, শেষ উচ্চতাটুকুতে শরীর তুচ্ছ হয়ে যায়। শুধু লাগে মনের জোর। সাঙ্ঘাতিক জেদ ছাড়া শেষ বাধা অতিক্রম করা যায় না।

কিন্তু কুলদীপ সেই মনের জোর হারিয়ে ফেলেছে। রবিকে বাদ দিয়ে সে একা উঠবে, এই বাস্তবতা সে মেনে নিতে পারছে না। রবি কি ঠিক মতন অ্যাডভ্যান্স বেস ক্যাম্পে ফিরে যেতে পারবে? বুকে ব্যথার কথা শুনলে ডাক্তার আর রবিকে কিছুতেই সেকেন্ড অ্যাটেমপ্ট করতে দেবে না। এত কাছে এসেও এভারেস্ট জয় করার কৃতিত্ব পাবে না রবি।

পৃথিবীতে কেউ জানে না, কোনোদিন জানবেও না, সেইখানে সেই তুষার রাজ্যে, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে কুলদীপ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল। নিছক দুঃখ নয়, ব্যর্থতা নয়, অত্যন্ত তীব্র এক বিচ্ছিন্নতা বোধ। এই রকম সময়ে দুনিয়ার সব সাফল্যই তুচ্ছ হয়ে যায়।

চোখের জল পড়তে না পড়তেই জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। পুরু গ্লাভস পরা হাতে সেগুলো কাচের মতন ভাঙতে হচ্ছে কুলদীপকে। সে একবার ভাবলো কি হবে আর ওপরে উঠে। এভারেস্ট চূড়া জয় করতেই হবে, তার কী মানে আছে? নিছক খ্যাতির জন্য? বিশ্ব এভারেস্ট জয়ীদের তালিকায় নাম তোলার জন্য? নিজের অহংকার পরিতৃপ্ত করার জন্য?

কান্না থামিয়ে ফেরার জন্য পা বাড়ালো কুলদীপ। নাঃ, শরীরকে আর এত কষ্ট দেবার কোনো দরকার নেই। বেস ক্যাম্পে শুয়ে থাকা কত আরামের।

একটু একটু করে নামছে কুলদীপ আর তার কানে কানে ম্যালোরির আত্মা যেন ফিস ফিস করে বলছে, বিকজ ইট ইজ দেয়ার। বিকজ ইট ইজ দেয়ার।

ম্যালোরিকে উত্তর দেবার ভঙ্গিতে কুলদীপ বেশ জোরে জোরে বলে উঠলো, তুমি পারনি। কিন্তু অন্যরা তো উঠেছে। ভবিষ্যতে আরও অনেকে উঠবে। সেই তালিকায় আমার নাম না থাকলেও ক্ষতি নেই।

বাতাসের ধ্বনি ম্যালোরির কণ্ঠস্বর হয়ে তাকে আবার বললো, কিন্তু তুমি এখন ফিরে গেলে সবাই বলবে, তুমি কাপুরুষ, কুলদীপ। তুমি তোমার বন্ধু রবির কথা চিন্তা করে ফিরে যাচ্ছো, তা কেউ বিশ্বাস করবে না। এমনকি তোমার বন্ধুও তাতে সন্তুষ্ট হবে না। সে তোমার খাঁটি বন্ধু, তোমার সাফল্যেই সে গর্ববোধ করবে। পরাজয়ে নয়।

কুলদীপ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে বললো ,কে ?

শুধু বাতাসের শব্দ নয়। তার স্পষ্ট মনে হলো, পেছনে এসে কেউ দাঁড়িয়েছে, তার পায়ের শব্দও সে শুনেছে।

কুলদীপ আবার বললো, কে ? কে ?

তবে কি রবি সুস্থ হয়ে আবার ফিরে এসেছে ? মজা করছে তার সঙ্গে ? কে কে বলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে কুলদীপ পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে উঠে যেতে লাগলো। রবির নাম ধরেও ডাকলো কয়েকবার। কেউ নেই। কোনো পায়ের ছাপও চোখে পড়ছে না।

কুলদীপের তখন মনে পড়লো, বিখ্যাত অভিযাত্রী শ্যাকলটনের অভিজ্ঞতার কথা। শ্যাকলটন একা একা উঠছিল। সামনে একটা খাড়া কঠিন বরফের দেওয়াল। আইস অ্যাক্স গেঁথে গেঁথে এগোতে হবে, এই সময় তার মনে হলো, কাছাকাছি অন্য কেউ আছে। সে জায়গা সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য, একটা পাখি পর্যন্ত থাকার সম্ভাবনা নেই, তবু শ্যাকলটনের স্পষ্ট মনে হচ্ছিল কোনো একজন মানুষ রয়েছে তার আশেপাশে কোথাও। এই অনুভূতি কিন্তু ভয়ের নয়। বরং অনেকখানি নির্ভরতার। সে যেন একটা দড়ি নিয়ে আসছে পেছনে পেছনে। শ্যাকলটন পা পিছলে পড়ে গেলেই সে ধরবে। একজন শুভার্থী বন্ধু, চরম বিপদ থেকে সে বাঁচবে। এই বিশ্বাসটা শ্যাকলটনের এমনই বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, বরফের দেওয়ালটা পার হবার পর বিশ্রাম নিতে গিয়ে সে একটা চকোলেট খাবে ভাবলো, চকোলেটটা বার করে ভেঙে, আধখানা সে অদেখা বন্ধুর দিকে

বাড়িয়ে দিয়ে বললো, এই নাও !

কেউ নেই বুঝতে পেরে কুলদীপ একটুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

রাওয়াত আর ফু দোরজি কি তার জন্য অপেক্ষা করছে ? ওরা কত দূরে ?

রেজর্স এজ পার হলে আসবে ব্ল্যাক রক রিজিয়ন। সেটা আরও ভয়াবহ। কালো শ্লেট পাথর, তাও আলগা আলগা, এর চেয়ে খাড়া বরফ অনেক ভালো এই পথে কেউ কি কখনো একা গেছে ? খানিকটা এগোতে গিয়ে কুলদীপ বুঝতে পারলো, বাতাসের বেগে সে ভারসাম্য রাখতে পারবে না। একবার পড়ে গেলে তার চিহ্নও খুঁজে পাবে না কেউ।

একটা একটা করে জিনিসপত্র ফেলে ভার কমাতে কমাতে এগোতে লাগলো কুলদীপ। তাতেও সুবিধে হচ্ছে না ; এক একটা পদক্ষেপে অনেক সময় চলে যাচ্ছে। আকাশ থেকে যদি রোদ মুছে যায়, তা হলে আর এগোবার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। এবার কুলদীপ দু' হাতে আরও পুরু আইডার ডাউন গ্লাভস পরে নিলো, তারপর হামাগুড়ি দিতে লাগলো সে। হামাগুড়ি দিলে ব্যালান্স রাখা যায়। একটা রিজ সে পার হয়ে এলো। এবার ব্ল্যাক রক এরিয়া। খানিকটা জিরিয়ে নিলো কুলদীপ। পেছন দিকে তাকিয়ে তার শরীর কেঁপে উঠলো। রেজর্স এজ দিয়ে একা একা ফিরে যাওয়া যেন আরও বিপজ্জনক। সামনে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ওয়াকি টকিতে সে প্রথমে রবির খবর নেবার জন্য বেস ক্যাম্পে যোগাযোগের চেষ্টা করলো। কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বাতাসের এত বেগ থাকলে যোগাযোগ হয় না। রাওয়াতদের কাছে ওয়াকি-টকি নেই, সুতরাং এটা সঙ্গে রেখে কী লাভ ? খানিকটা বরফ খুঁড়ে তার মধ্যে পুঁতে দিল যন্ত্রটা। এখন শুধু অক্সিজেন সিলিন্ডার আর ক্যামেরাটা ছাড়া আর কিছুই রইলো না তার কাছে। যদি সে পথ হারিয়ে ফেলে, তা হলে তাকে না খেয়ে মরতে হবে। অক্সিজেনই বা কতক্ষণ টিকবে ?

ফু দোরজি আর রাওয়াত ততক্ষণে পৌঁছে গেছে সাউথ সামিট-এর কিনারায়। ওরা মাঝে মাঝে পেছন ফিরে খুঁজছে কুলদীপ আর রবিকে। অনেকক্ষণ দেখা পায়নি। একবার চমকে উঠলো দু'জনেই। চতুর্দিকের শুভ্রতার মধ্যে একটা কালো মূর্তি হাত নাড়ছে ওদের দিকে। তাকে মানুষ বলে মনে হয় না। কুলদীপ তখনো হামাগুড়ি দিচ্ছে বলে দূর থেকে তাকে মানুষ মনে করা সত্যিই শক্ত। ফু দোরজির বদ্ধমূল বিশ্বাস হলো ইয়েতি। কারণ, দু'জনের বদলে একজন আসবে এই ভয়ঙ্কর পথে তা ওরা চিন্তাই করতে পারছে

না।

রাওয়াত সাহসী পুরুষ। সে বললো, ইয়েতি যদি বাঁদরের মতন একটা প্রাণীও হয়, আমরা দু'জনে রয়েছি, ভয় কী ?

ফু দোরজি বললো, ইয়েতির অলৌকিক শক্তি আছে। দু'জন কেন, দশজন মানুষও পারবে না তার সঙ্গে।

রাওয়াত তবু আইস অ্যাক্সটা বাগিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। অ্যাবোমিনেব্‌ল স্নো ম্যানের সে মুখোমুখি হতে চায়।

কুলদীপও দেখতে পেয়েছে ওদের, সে চিৎকার করে বলার চেষ্টা করছে, আই অ্যাম কামিং! আই অ্যাম কামিং! তা শুনতে পাচ্ছে না ওরা। কুলদীপও ভাবছে, তাকে কোনো অলৌকিক জন্তু মনে করে যদি ওরা আরও দূরে সরে যায়! সে এখন চেষ্টা করেও দু'পায়ে খাড়া হতে পারছে না।

ফু দোরজি আর রাওয়াত যখন কুলদীপকে টেনে তুললো, তখন তার প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবার মতন অবস্থা। ওরা তাকে ধরাধরি করে নিয়ে এলো সাউথ সামিট-এর বাঁ দিকে একটা সরু সুড়ঙ্গের মতন জায়গায়। সাউথ সামিট থেকে এই দিক দিয়ে হিলারিজ চিমনির দিকে যাওয়া যায়। দু'পাশে খাড়া প্রাচীরের মতন, এখানটায় বাতাসের বেগ কম।

ফু দোরজি অন্য দু'জনকে খানিকটা করে ফলের রস খেতে দিল।

তাতে খানিকটা চাঙ্গা হয়ে কুলদীপ মিনতি করে বললো, কফি আছে ? একটু কফি যদি পেতাম!

ফু দোরজি তার পিঠের ঝোলাঝুলির মধ্য থেকে একটা ফ্লাস্ক দেখিয়ে বললো, কফি আছে। কিন্তু আজ সকালে বেরুবার সময় এই প্রতিজ্ঞা করেছি যে টপে উঠে এই কফি আমরা পান করবো। তার আগে নয়।

হিলারিজ চিমনি অতিক্রম করতে পারলেই পৃথিবীর চূড়া। সাফল্য তাদের হাতছানি দিচ্ছে। কিন্তু এই হিলারিজ চিমনি থেকেই পড়ে গিয়ে কত লোক জখম হয়েছে কিংবা হারিয়ে গেছে তার শেষ নেই। শেষের এই দূরত্বটাকেই মনে হয় অন্তবিহীন পথ।

ফু দোরজির কথাটা শুনে কুলদীপ চমকে উঠলো। 'আমরা কফি পান করবো' মানে কী ? ওরা দু'জন ? এক দড়িতে দু'জন যাওয়াই স্বীকৃত পদ্ধতি। তিনজন যাওয়ার কথা কখনো শোনা যায়নি, তা অত্যন্ত বিপজ্জনকও বটে! একটু বেসামাল হলেই আট হাজার ফিট নীচে পতন।

এটা ভদ্রতা-সৌজন্য দেখানোর জায়গা নয়। অনেক দিনের কষ্ট, পরিশ্রম

ও জীবনের ঝুঁকির পর সিদ্ধি মেলার সম্ভাবনা খুব কাছে এসে গেছে। এখন একজনের জন্য অন্য দু'জন নিজেদের বিপদ আরও বাড়াবে কেন ? রাওয়াত আর ফু দোরজি যদি এখন কুলদীপকে সঙ্গে নিতে প্রত্যাখ্যান করে, তা হলে ওদের দোষ দেওয়া যাবে না।

কুলদীপ রাওয়াতের দিকে তাকালো, সে চোখ সরিয়ে নিল। রবির ফিরে যাওয়ার কাহিনী শুনে ওরা দু'জন বিশেষ বিচলিত হয়নি। এখন অন্যের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নয়। এরকম অনেকেই তো শেষের আগে ফিরে যায়।

রাওয়াত বললো, এই সুড়ঙ্গটার কথা আগে কেউ লেখেনি। এটা বেশ আরামদায়ক বিশ্রামের জায়গা। এটার নাম দেওয়া যাক, ইন্ডিয়া'জ ডেন, কী বলো ?

কুলদীপ মাথা নাড়লো।

ফু দোরজি বললো, এখান থেকে মাকালু আর লোৎসে দেখা যাচ্ছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা কোথায় গেল ?

রাওয়াত বললো, আমি শুধু এভারেস্ট দেখছি ! এত কাছে আসতে পারবো, নিজেই বিশ্বাস করতে পারিনি !

কুলদীপ হিলারি'জ চিমনির পাশ দিয়ে সবচেয়ে উঁচু পয়েন্টটার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলো। তারপর বললো, আমি ফিট হয়ে গেছি। তোমরা এগিয়ে পড়ো।

রাওয়াত বললো, তার মানে ? তুমি...

কুলদীপ বললো, আমি এখানে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবো। তোমরা যাও, আর সময় নষ্ট কোরো না।

ফু দোরজি কুলদীপকে জড়িয়ে ধরে বললো, আপনি কী বলছেন সিংজী ? আপনাকে বাদ দিয়ে আমরা যাবো ? এত দূর এসে আপনি থেমে যাবেন ? কক্ষনো হতে পারে না।

কুলদীপ বললো, এক দড়িতে তিনজন—

ফু দোরজি বললো, হাঁ, এক দড়িতেই তিনজন বাঁধা থাকবো। আমি আগে আগে যাবো।

রাওয়াত বললো, চীয়ার আপ, কুলদীপ ! আমরা জয়ী হবোই। ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল !

নতুন ভাবে আবার দড়ি বাঁধলো ফু দোরজি। প্রথমে সে, তারপর রাওয়াত,

শেষে কুলদীপ। কুলদীপ একেবারে পেছনে রইলো, কারণ সে ছবি তুলবে। বোঝা কমাবার জন্য মাত্র এক বোতল করে অক্সিজেন সঙ্গে নিল ওরা।

সুড়ঙ্গটার বাইরে পা বাড়াতেই বাতাসের একটা প্রবল ঝাপটা লাগলো। অদ্ভুত একটা হা-হা শব্দ হচ্ছে বাতাসে। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা এই যে রোদ্দুর আছে, চার পাশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তুষার ঝড় উঠলে আর এগোনোর আশা ছিল না। এই বিশাল শূন্যতার মধ্যে কত সামান্য আর অকিঞ্চিৎকর দেখাচ্ছে এই তিনজন মানুষকে। এখানকার প্রত্যেকটা চূড়া যেন জীবন্ত, তারা কৌতুক-ঔৎসুক্যে লক্ষ করছে এই তিনটি ক্ষুদ্র প্রাণীকে, যেন তারা পরস্পর ফিসফিস করে বলছে, পারবে ? না পারবে না ? পারবে ?

যদিও বইতে অনেকবার পড়েছে, তবু কুলদীপ এখানকার দৃশ্য দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারলো না। এর আগে তারা এমন অনেক জায়গা পেরিয়ে এসেছে, যেখানে চিরতুষারের রাজত্ব, এক টুকরো পাথরও চোখে পড়েনি। তাঁবু খাটাবার জন্য অনেকখানি বরফ খুঁড়তে হয়েছে, তবু পাথর লাগেনি কুঠারে। কিন্তু এখানে আঠাশ হাজার ফিটের বেশি উচ্চতায় পৌঁছেও মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে নগ্ন পাথর। পাহাড়ের এক-একটা অংশ এমনই খাড়া যে সেখানে বরফও জমতে পারে না। হিলারিজ চিমনিতে কুঠার গাঁথার চেষ্টা করেও পারছে না ফু দোরজি। পা পিছলে পড়ে যাচ্ছে বারবার। এক এক জায়গায় নিরেট প্রাচীরের মতন দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, সেখানে অনেকবারের চেষ্টায় আইস অ্যাক্সটা ছুঁড়ে ছুঁড়ে প্রাচীরের মাথা পেরিয়ে আরও দূরে গাঁথছে। তারপর দড়ি বেয়ে বেয়ে উঠছে ফু দোরজি !

একটা ছবিতে ফু দোরজি দড়ি ধরে ঝুলছে শূন্যে।

ঐ জায়গাটাতে রাওয়াতও নিজে উঠতে পারেনি। তলা থেকে কুলদীপ তাকে ঘাড়ে করে ঠেলে তুলে দিয়েছিল। তারপর ওরা দু'জন ওপর থেকে একসঙ্গে দড়ি ধরে টেনে তুলেছে কুলদীপকে। যেন বঁড়শিতে গাঁথা একটা বৃহৎ মাছ।

একা একা এই সব প্রাচীর অতিক্রম করা অসাধ্য ছিল। এই রকম বাধা একটা নয়। পরের পর, পরের পর, মনে হয় যেন শেষ আর হবে না।

এই সব দৃশ্যের কোনোটাতেই কুলদীপকে দেখা যাচ্ছে না। কারণ ছবিগুলো সব তারই তোলা।

পর পর ছবি উল্টে যাচ্ছে গীতা। কুলদীপ কোনো সাড়া শব্দ করছে না। শেষ কয়েক ফিট তিনজনে হাত ধরাধরি করে উঠেছিল। তারপর জাতীয়

পতাকা পুঁতে দেওয়া... ।

একটা ছবি দেখে খুব হাসতে লাগলো গীতা। এটা এভারেস্ট জয় করে ফিরে আসার একটা দৃশ্য। কাঠমাণ্ডুর কাছাকাছি এক জায়গায় বানানো হয়েছে এক বিশাল তোরণ। তার এক দিকে সফল এভারেস্ট অভিযাত্রী দলটিকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য জমায়েত হয়েছে অনেক মানুষ। অন্যদিকে খানিক দূর থেকে হেঁটে আসছে অভিযাত্রী দল।

অভ্যর্থনাকারীদের মধ্যে রয়েছে গীতা। অভিযানের সাফল্যের খবর পেয়ে সে দার্জিলিং থেকে ছুটে এসেছিল কাঠমাণ্ডু। দূরের দলটার মধ্যে সে কুলদীপ আর রবিকে দেখতে পেয়ে প্রবল ভাবে হাত নেড়ে চিৎকার করতে লাগলো।

রবিই প্রথম দেখতে পেল গীতাকে। দল ছেড়ে সে এগিয়ে গেল গীতার দিকে। কুলদীপ দাঁড়িয়ে রইলো একটু দূরে। গীতা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো রবিকে।

রবি গম্ভীর ভাবে বললো, তোমাকে একটা দুঃখের কথা জানাতে হচ্ছে, গীতা। রেডিও'র খবরে ভুল ছিল। কুলদীপ পরমজিৎ সিং শেষ পর্যন্ত এভারেস্টের টপে উঠতে পারেনি। প্রথম ভারতীয় হিসেবে এভারেস্ট জয় করেছে রবি দত্তা। এই আমি!

গীতার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। অবিশ্বাসের সুরে সে বললো, কুলদীপ পারেনি?

রবি বললো, কেন যে এই রকম ভুল খবর দেয়। কুলদীপের বাবা-মা কতটা ডিসাপয়েন্টেড হবেন বলো তো! ছি ছি ছি। আমার নিজেরই খুব লজ্জা করছে!

এবার কাছে এগিয়ে এলো কুলদীপ এবং আরও দু'তিনজন।

কুলদীপ ম্লান মুখ করে বললো, এবারে আমি পারলাম না। খুব ব্লিডিং ট্রাব্‌ল হচ্ছিল। আর ওপরে উঠতে গেলে মরে যেতাম।

অন্য দু'তিনজন বললো, ভেরি স্যাড। আর মাত্র দেড় হাজার ফিট বাকি ছিল। এরকম একটা চান্স মিস করলো কুলদীপ। ওর ওপর আমাদের সকলেরই খুব আশা ছিল।

রবি বললো, কুলদীপ পারেনি, কিন্তু আমি যে এভারেস্ট জয় করলাম, তার জন্য তুমি খুশি হওনি?

গীতা একবার কুলদীপের দিকে, আর একবার রবির দিকে তাকাতে লাগলো। তার মুখে ফুটে উঠেছে এক বিচিত্র অভিব্যক্তি। কুলদীপ পারেনি?

কুলদীপ পারেনি ?

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো হো হো করে ;

ছবির বইটা বন্ধ করে গীতা তাকালো কুলদীপের দিকে। কুলদীপের দুই চক্ষু বোজা। সে ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা বোঝা যায় না। দু'ফোঁটা চোখের জল নেমে এলো তার গাল বেয়ে।

॥ ৫ ॥

সেই রাত্তিরেই কুলদীপ আত্মহত্যা করার চেষ্টা করলো।

তার মাথার কাছে একটা টেলিফোন দেওয়া হয়েছে। একটু আগে নার্স তাকে খাইয়ে দিয়ে গেছে। ক্যাবিনে আর কেউ নেই। কুলদীপ টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াতেই সেটা ঝনঝন করে বেজে উঠলো।

গীতা ফোন করছে। কুলদীপ প্রথমে কোনো সাড়া দিল না। গীতা বারবার তার নাম ধরে ডাকছে। কয়েক সেকেন্ড পরে কুলদীপ বিকৃত গলায় বললো, রং নাম্বার !

টেলিফোনটা রেখে দিয়েই আবার তুললো কুলদীপ। তারপর সেটা সে তার গলায় জড়ালো। দু'তিন পাক জড়াবার পর সে রিসিভারটা ধরে টান দিল। কিন্তু তার হাতে তেমন জোর নেই যাতে ফাঁস লেগে দম বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সে দু'হাত দিয়ে টানবার চেষ্টা করলো, তাও যথেষ্ট জোর হচ্ছে না।

আবার সে কর্ডটা খুলে গলায় শুধু দু'পাক জড়ালো, রিসিভারটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেঁধে ফেললো খাটের মাথার সঙ্গে। এরপর সে অসম্ভব মনের জোরে একটু একটু করে সরে আসতে লাগলো পাশের দিকে। খাটের এক প্রান্তে এসে সে একটুখানি ঝুঁকে রইলো।

রাত দশটা বেজে গেছে, হাসপাতাল এখন নির্জন, নিঃশব্দ হয়ে এসেছে। একটু আগে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে কুলদীপকে, তবু তার ঘুম আসেনি। ইদানীং ঘুমের ওষুধে ঠিক কাজ হয় না। মাঝে মাঝে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। শরীরের কতগুলো কলকব্জা যে খারাপ হয়ে গেছে, তা যেন এখনো জানা যায়নি। নিত্য নতুন উপসর্গ দেখা যাচ্ছে।

খাট থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় কুলদীপ ভাবলো, এখানে আমি কতদিন শুয়ে থাকবো ?

হাসপাতাল তার কোনোদিন পছন্দ নয়। তার কোনো আত্মীয়-বন্ধু অসুস্থ

হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে কুলদীপ কখনো তাদের দেখতে আসেনি, এড়িয়ে গেছে। তার যখন দশ-এগারো বছর বয়েস, তখন তার ঠাকুর্দার স্ট্রোক হয়েছিল, পাতিয়ালার হাসপাতালে ছিলেন কয়েকদিন। ঠাকুর্দা কুলদীপকে খুব ভালো বাসতেন, কুলদীপকে দেখতে চাইতেন। মা-বাবা জোর করে ধরে আনতেন কুলদীপকে। হাসপাতালের ফিনাইল আর ডেটলের গন্ধ তার অসহ্য লাগতো ঠাকুর্দা তার গায়ে হাত বুলোতেন, কুলদীপ ছটফট করতো, এক সময় পালিয়ে গিয়ে বাগানে ছুটোছুটি করতো।

ঠাকুর্দার মৃতদেহ বার করে নেওয়ার সময় কুলদীপ শেষ হাসপাতালে এসেছিল। তারপর এত বছর সে আর কোনো হাসপাতালের চৌকাঠ পেরোয়নি।

কোন্ সুস্থ মানুষের হাসপাতালে আসতে ভালো লাগে ?

অথচ গীতা প্রতিদিন দু' বেলা নিয়ম করে আসছে। যেন এটা তার কর্তব্য। গীতার মুখে অবশ্য সামান্য বিরক্তির চিহ্নও ফুটে ওঠে না। সে সব সময় কুলদীপকে খুশী রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু এটা কি খানিকটা অভিনয় নয় ? কুলদীপের মা-ও আসেন। পুত্রস্নেহে অন্যান্য অসুবিধে হয়তো তুচ্ছ হয়ে যায়, কিন্তু কুলদীপের জন্যই মাকে দিল্লিতে থাকতে হচ্ছে। গ্রামের বাড়িতে বাবাও অসুস্থ, এখন বাবার কাছেই মায়ের থাকা উচিত ছিল।

কুলদীপের ভাই সুরিন্দর কিছুদিন মাকে নিয়ে ছিল দিল্লিতে। সে বেচারার চাকরি আছে, তাকে ফিরে যেতে হয়েছে কানপুরে। মা একা রয়েছেন। দিল্লির এই ট্র্যাফিকে মাকে রোজ অটো রিক্সা নিয়ে আসতে হয় সেই রাজেন্দ্রনগর থেকে। রাজেন্দ্রনগরে মায়ের এক জ্যাঠতুতো ভাইয়ের বাড়ি। সে বাড়ির একটি মেয়ে কয়েকদিন মাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, এখন আর আসে না। সেটাই তো স্বাভাবিক, তার কলেজ আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে, সে শুধু শুধু হাসপাতালে এসে বসে থাকবে কেন ?

কতদিন কুলদীপকে এখানে থাকতে হবে কিছু ঠিক নেই ! একের পর এক স্পেশালিস্ট ডাক্তার আসছে ! কেউ কোনো আশা দিতে পারেনি। কথা বলার ক্ষমতা আর হাত দুটো নাড়া চাড়া করবার ক্ষমতা ছাড়া সে আর কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ফিরে পায়নি। বুকের মধ্যে হাজার রকম জ্বালা যন্ত্রণা। কোমরের নীচে তার শরীরের যে অস্তিত্ব আছে, সেটাই টের পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে পা দুটো দেখে নিতে হয়। কখন হিসি পায়, সে বোধও তার নেই। এক-দেড় বছরের বাচ্চা ছেলের মতন বিছানা ভিজিয়ে ফেলে।

ডাক্তার-নার্সদের ফিসফাস কথা সে শুনে ফেলেছে কয়েকবার। অন্য সব অঙ্গগুলো নষ্ট হয়ে গেলেও তার মস্তিষ্ক আছে পুরোপুরি সজাগ। অনেক সময় সে ইচ্ছে করে চোখ বুজে থাকে, তাকে ঘুমন্ত মনে করে ডাক্তাররা তার ক্যাবিনের মধ্যেই তার রোগ নিয়ে আলোচনা করে। কুলদীপ এই সত্যটা বুঝতে পেরেছে, বাকি জীবন তাকে শয্যাশায়ী হয়েই কাটাতে হবে। চলাফেরার ক্ষমতা দূরে থাক, সে নিজের চেষ্টায় বিছানায় উঠেও বসতে পারে না। একজন ডাক্তার, ডক্টর ওমপ্রকাশ সদ্য আমেরিকা থেকে ফিরেছেন, তিনি বলছিলেন, ভারতে এই রোগের যতখানি চিকিৎসা সম্ভব তা সবই করে দেখা হয়েছে। এর চেয়ে বেশি ফল আর পাবার আশা নেই। এই ধরনের পেশেন্টদের সাত-আট মাসের মধ্যে হঠাৎ সাঙ্ঘাতিক স্ট্রোক হবারও সম্ভাবনা থাকে, তখন আর বাঁচানো যায় না।

এই হাসপাতাল তাকে আর কতদিন রাখবে? এই দামি হাসপাতালে তার সব রকম চিকিৎসা ও ওষুধপত্রের খরচ দিচ্ছে ভারত সরকার। তার কারণ কুলদীপ সিং একজন ন্যাশনাল হিরো। এভারেস্ট জয়ী হিসেবে সে অর্জুন পুরস্কার পেয়েছে, ভারত সরকার তার নামে পদ্মভূষণ সম্মান ঘোষণা করেছে।

কিন্তু আসলে কি কুলদীপ সরকারের টাকা নষ্ট করাচ্ছে না। সে একটা জড়, অপদার্থ। সে এই হাসপাতালের একটা শয্যা দখল করে আছে। এখানে অন্যদের চিকিৎসা হতে পারতো, যাদের সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে। তার জন্য অনেকে সেই সুযোগ পাচ্ছে না।

অন্যরা তার কাছে সহানুভূতি দেখাবার নামে যা দেখায়, তা হলো অনুকম্পা। অযাচিত দায়। যতদিন সে বাঁচবে, তাকে এই সব কথা শুনতে হবে। দয়া, অনুকম্পা—এসব তার কাছে অসহ্য! অমৃতসর টেম্পলের সামনে দু'পা কাটা একজন লোক, বুকে চট বেঁধে রাস্তা দিয়ে গড়ায় আর ভিক্ষে করে। তার সঙ্গে কুলদীপের তফাত কী।

(যে মানুষের জীবনের সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, তার বেঁচে থাকার কোনো মূল্য নেই।)

কুলদীপ খাট থেকে আর একটু ঝুঁকলো। এখান থেকে নীচে পড়ে গেলেই তার গলার ফাঁসে হ্যাঁচকা টান লাগবে, দম একেবারে বন্ধ হতে লাগবে বড় জোর দু'তিন মিনিট। খুব কষ্ট হবে ঠিকই, কিন্তু সারা জীবনের তুলনায় দু'তিন মিনিট আর এমন কি!

রবির সঙ্গে আর দেখা হলো না। কেউ রবির খবর সঠিক দিতে পারে না।

রবিও কি হাঁটতে পারে না, সে একবার দেখা করতে আসতে পারলো না তার সঙ্গে ?

বিদায় রবি। বিদায় গীতা। মা, তুমি দারুণ দুঃখ পাবে জানি, কিন্তু এতেই তোমার ভালো হবে। সারা জীবন একটা পঙ্গু ছেলেকে তুমি বহন করতে কী করে ?

কুলদীপের চোখে ভেসে উঠলো এভারেস্ট শৃঙ্গ।

সেই বিশাল শুভ্রতা, সেই মহান বিস্তারের কথা চিন্তা করতেই কুলদীপের হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠতো। আহ্, ওখানেই যদি তার মৃত্যু হতো। ওখানে সে শুয়ে থাকতো চির-তুষারের শয্যায়। কি শান্তি।

আর বেশি দেরি করা যাবে না।

ফোনের রিসিভারটা এতক্ষণ নামানো রয়েছে বলে যদি অপারেটর চিন্তিত হয়ে পড়ে। যদি খোঁজ খবর নেয়। রিসিভারে কোনো আওয়াজ নেই, বোধহয় ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে।

পাহাড় থেকে নামার পর বাবার সঙ্গে দেখাই হলো না। এভারেস্ট অভিযানে যোগ দেবার আগে বাবা আপত্তি করেছিলেন, ছেলের জন্য ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু দু' নম্বর বেস ক্যাম্পে কুলদীপ বাড়ি থেকে কয়েকটি চিঠি পেয়েছিল। তাতে গীতার চিঠি ছিল, বাবারও একটা চিঠি ছিল। বাবা লিখেছিলেন, তুই ঠিক সফল হবি, কুলদীপ। তোকে নিয়ে আমাদের কত গর্ব। এখানে আমাদের সারা গ্রামের মানুষ তোদের খবর শোনার জন্য রেডিওতে কান পেতে থাকে। তুই জয়ী হয়ে ফিরে এলে এখানে একটা বিরাট উৎসব হবে। সবাই প্ল্যান করে রেখেছে।

বাবার সঙ্গে দেখা করার যে সময়ই পাওয়া গেল না। কাঠমাণ্ডু থেকে দিল্লিতে এসে সম্বর্ধনার পালা ফুরোতে না ফুরোতেই লেগে গেল যুদ্ধ। এভারেস্টের কথা ভুলে সবাইকে চলে যেতে হবে ফ্রন্টে। রবি ভালো করে চেক আপ করাবারও সময় পেলো না।

দিস ড্যাম্‌ন্‌ড ওয়ার। ভারত আর পাকিস্তানের নেতাদের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। কেউ কারুর এক ইঞ্চি জমি দখল করতে পারলো না, ফিরে গেল আগের জায়গায়। শুধু শুধু দশ দিনের গোলাগুলি ছোঁড়ায় কোটি কোটি টাকা খরচ আর কয়েক হাজার মানুষের প্রাণ....

যুদ্ধের কথা চিন্তা করতেই কুলদীপের এত রাগ এসে গেল যে সে আর এক মুহূর্ত দেরি করলো না। সে গড়িয়ে পড়ে গেল নীচে।

কিন্তু পড়বার সময় তার মাথার কাছের টিপয় থেকে একটা বড় কাচের জাগও পড়ে গিয়ে ঝনঝন শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে ছুটে এলো দু'জন নার্স। আর কয়েক মুহূর্ত দেরি হলে কুলদীপকে বাঁচানো যেত না।

নার্স দু'জন ধরাধরি করে কুলদীপকে ওপরে তুলে দিল। কুলদীপ উন্মাদের মতন চিৎকার করতে লাগলো, নো, নো! লিভ মি অ্যালোন!

ভিড় জমে গেল তার ক্যাবিনে। একজন ডাক্তার তাড়াতাড়ি ঘুমের ইঞ্জেকশন দিল তাকে। আস্তে আস্তে জড়িয়ে গেল কুলদীপের কণ্ঠস্বর। সে হারিয়ে গেল ঘুমের দেশে।

পরদিন অনেক লোক দেখা করতে এলো কুলদীপের সঙ্গে। কুলদীপ একটাও কথা বললো না কারুর সঙ্গেই। ঘুমের ভান করে রইলো। তার সারা মুখে বিমর্ষতার ছাপ। কুলদীপের মা অনেকক্ষণ থাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। তাঁরও শরীর ভালো নয়। গীতা রয়ে গেল। সে এক কোণে বসে একটা বই খুলে রাখলো চোখের সামনে।

নার্স এসে একবার কুলদীপের গায়ের চাদর পাল্টে দিয়ে গেল। তখন দেখা গেল যে কুলদীপের হাত দুটো দু' পাশে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা।

একবার কুলদীপ চোখ মেলতেই চোখাচোখি হয়ে গেল গীতার সঙ্গে। গীতা কাছে এগিয়ে এসে বললো, কুলদীপ, তোমার কি হয়েছে? তুমি কার ওপর রাগ করেছো?

কুলদীপ তাকে বাধা দিয়ে বললো, তোমাকে কিছু বলতে হবে না। তুমি আগে আমার কথা শোনো।

গীতা কুলদীপের বুকে হাত রাখতেই কুলদীপ আবার ধমক দিয়ে বললো, ডোন্ট টাচ মি! শোনো। আমি এখন আর পুরুষ নই! পুরোপুরি মানুষও নই। আমি একটা জড়পদার্থ। এরকম একটা পদার্থের সঙ্গে কোনো মেয়ের বিয়ে হয় না। তোমার হাতের ঐ আংটিটা খুলে ফেল! আমাদের এনগেজমেন্ট ক্যানসেল্ড।

গীতা বললো, কে বলেছে তুমি জড়পদার্থ। তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছো, তুমি আগেকার কুলদীপই আছো। আমি এই কুলদীপকেই ভালোবাসি।

কুলদীপ বললো, শরীর ছাড়া শুধু মনটার আবার মূল্য থাকে নাকি? ওসব ন্যাকামি আমি বিশ্বাস করি না। আমার মন, এই যে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি, আমার এই মনটাও আর তোমাকে চায় না। তুমি যাও, তুমি আর এসো

না।

গীতা বললো, কুলদীপ, তোমার মেজাজটা আজ ভালো নেই।

কুলদীপ বললো, আমি আর কোনোদিন সুস্থ হবো না। আমি জেনে নিয়েছি, ডাক্তাররা আমাকে আর বড় জোর এক বছর এই অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না, গীতা। তুমি শুধু শুধু কেন এখানে সময় নষ্ট করবে? তুমি রবিকে বিয়ে করো, রবিও তোমায় ভালোবাসে। আমি খুব খুশী হবো।

গীতা আরও কিছু বলবার আগেই কুলদীপ চেঁচিয়ে উঠলো, চলে যাও, চলে যাও, চলে যাও। আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না। আমি দয়া সহ্য করতে পারি না।

কুলদীপ আর কোনো কথা শুনলো না, বারবার ঐ একই কথা বলতে লাগলো।

কুলদীপের ব্যবহার বরাবরই খুব ভদ্র ও সংযত। কিন্তু এখন সে যেন হঠাৎ বদলে গেছে। সকলের সঙ্গে রুক্ষ স্বরে কথা বলে। সে বুঝে গেছে যে তার মৃত্যু আসন্ন, এটাকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। আবার সে পঙ্গু হয়েও বেঁচে থাকতে চায় না।

এ পৃথিবীতে তার সবচেয়ে প্রিয় দু' জন। এদের দু' জনকেই যেন সে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। ডাক্তার ও নার্সদের সে বলে দিয়েছে যে, এদের দু' জনকে যেন তার কাছে আসতে না দেওয়া হয়। মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আসতে বারণ করে দেওয়া হয়েছে। গীতা তবু আসে। একদিন সে নার্সদের বাধা এড়িয়ে ঢুকে পড়লো ক্যাবিনের মধ্যে।

কুলদীপ সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ঘুরিয়ে নিল দেওয়ালের দিকে।

তারপর কঠিন গলায় বললো, আমি আর একবারও তোমার মুখ দেখতে চাই না। লেট মি ডাই ইন পীস।

গীতা তার হাত থেকে আংটিটা খুলে টেবিলের ওপর রাখলো। খুব নীচু গলায় বললো, গুড বাই, কুলদীপ। গুড বাই।

তারপর সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বেরিয়ে গেল ক্যাবিন থেকে।

একটু পরে কুলদীপ হুইল চেয়ার ঘুরিয়ে এনে আংটিটা তুলে দেখতে লাগলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। যেন এটা একটা অচেনা জিনিস। এক সময় সেটা খসে পড়লো তার হাত থেকে। কুলদীপ নিচু হয়ে তুলতে গেল। পারলো না। অতটা নিচু হবার ক্ষমতা তার নেই।

একমাত্র একজন ভিজিটরকে দেখেই কুলদীপ এর পর দিন একটু খুশি হয়ে উঠলো। শেরপা ফু দোরজি। দরজার কাছে তাকে দেখা মাত্র কুলদীপের মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। অনেকদিন বাদে।

কুলদীপ হাত তুলে বললো, ফু দোরজি। আও, আও, অন্দরমে আও।

কাছে এসে ফু দোরজি বললো, সিং সাব, তোমার কী হয়েছে?

কুলদীপ ফ্যাকাসে ভাবে হেসে বললো, আমার সব শেষ হয়ে গেছে, ফু দোরজি।

ফু দোরজি সে কথায় আমল না দিয়ে বললো, যুদ্ধে গিয়ে তোমার পায়ে চোট লেগেছে। আবার ঠিক হয়ে যাবে। সেকেণ্ড বেস ক্যাম্পে তোমার পায়ে একবার চোট লেগেছিল, মনে আছে? সারিয়েছিলাম। ডাক্তারের দাওয়াইতে কিছু কাজ হবে না। তুমি আমার হাত ধরে উঠে দাঁড়াও। আমি তোমাকে হাঁটিয়ে দিচ্ছি।

একজন নার্স কাছাকাছি পাহারায় ছিল। ফু দোরজি হাতটা বাড়িয়ে দিতেই সে হাঁউ হাঁউ করে এসে বললো। একি, একি, ও কি হচ্ছে? ডোন্ট ডু দ্যাট।

ফু দোরজি একটু সরে গিয়ে বললো, রবি দত্তা সাহেবও তো গুলিতে জখম হয়েছে। সে সাহেব কেমন আছে?

কুলদীপ বললো, সে তো এই হসপিটালেই আছে শুনেছি। কিন্তু সে একবারও আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। সিস্টার, একবার মেজর রবি দত্তকে খবর দিতে পারেন? তাকে বলবেন, আমাদের একজন খুব ভালো বন্ধু এসেছে পাহাড় থেকে। যদি সে একবার আসতে পারে।

নার্স বললো, মেজর রবি দত্ত। তিনি তো আর এই হাসপাতালে নেই?

কুলদীপ বললো, এখানে নেই? কোথায় গেছে? সে ভালো হয়ে গেছে?

নার্স বললো, খুব সম্ভবত তাই। তিনি গ্রামের বাড়িতে চলে গেছেন, যতদূর জানি। কুলদীপ বললো, সে রাস্কেলটা আমার সঙ্গে একবার দেখা করে গেল না?

নার্স বললো, ডাক্তাররা বারণ করেছিলেন। আপনার ইমোশনাল ডিসটার্বেন্স হবে ভেবে।

ফু দোরজি মনের ভুলে এই সময় একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল, নার্স তাকে তাড়া দিয়ে বললো, নো স্মোকিং। নো স্মোকিং।

ফু দোরজি লজ্জা পেয়ে প্যাকেটটা পকেটে ভরে ফেললো।

কুলদীপ তাকে জিজ্ঞেস করলো, ফু দোরজি, তুমি দিল্লিতে এসেছো কেন?

আবার কোনো এক্সপিডিশানে যাবে বুঝি ?

ফু দোরজি বললো, হাঁ সাব। একটা ফ্রেঞ্চ টিমের সঙ্গে মাকালু পীকে যাবো। এখানে জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে এসেছি। খুব বড় টিম। এটায় সাকসেসফুল হলে সাহেবরা আমাকে তাদের দেশে মাউন্টেনিয়ারিং-এর ট্রেনার করে নিয়ে যাবে বলেছে।

এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা বলছিল ফু দোরজি। হঠাৎ থেমে গিয়ে বললো, চিন্তা করো না, সাব। তুমি ঠিক ভালো হয়ে যাবে। আবার আমরা এক সঙ্গে পাহাড়ে উঠবো।

কুলদীপ বললো, না, আমি আর পাহাড়ে উঠবো না, ফু দোরজি। আমি সব পাহাড় ছাড়িয়ে, এভারেস্টের থেকেও অনেক উঁচুতে চলে যাবো।

কুলদীপ তার একটা আঙুল তুলে আকাশের দিকে দেখালো।

ফু দোরজি লেখাপড়া শেখেনি বটে, কিন্তু তার নিজস্ব একটা দার্শনিকতা আছে। সে হেসে বললো, সিংসাব,ঐ ওপরে যাওয়া তো সোজা। যখন তখন মানুষ চলে যায়। কিন্তু পাহাড় জয় করা বড় শক্ত কাজ। জীবনে তো শক্ত কাজই ভালো লাগে, তাই না ?

অন্যরা মিথ্যে স্তোকবাক্য আর সান্ত্বনার কথা শোনায়। ফু দোরজির কথায় ফুটে ওঠে প্রবল আশাবাদ। বিদায় নেবার সময় সে বললো, আমি এই বলে গেলাম মিলিয়ে দেখো, সিং সাব। আবার আমাদের দেখা হবে, পাহাড়ে।

॥ ৬ ॥

গীতা আর আসে না, কিন্তু কুলদীপ তার প্রতীক্ষা করে।

সে নিজেই সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে গীতার সঙ্গে। তাকে অত্যন্ত কঠোর কথা বলেছে। তাকে দিনের পর দিন বলেছে আংটি খুলে ফেলতে। তবু ক্যাবিনে একা বসলেই কুলদীপের মনে হয়, গীতা এসে হঠাৎ উঁকি দেবে।

গীতা সত্যিই এলে নিশ্চিত কুলদীপ আবার কঠোর ব্যবহার করবে তার সঙ্গে, আবার ফিরিয়ে দেবে।

কুলদীপ অবশ্য জানে না যে এর মধ্যে গীতা আরও কয়েকবার আসবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এই সেকেন্ড ফ্লোরে তাকে ঢুকতেই দেওয়া হয় না। ডাক্তারদের কড়া নির্দেশ আছে। গীতার সঙ্গে যতবার কুলদীপ রাগারাগি করেছে, ততবারই কুলদীপের লাংসে ব্লাড ক্লট জমেছে। এতে যে-কোনো সময় নিঃশ্বাস একেবারে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এখন কোনো কারণেই

কুলদীপের মানসিক উত্তেজনা ঘটানো চলে না।

একজন গুরুতর রুগীর মানসিক উত্তেজনা ঘটানো উচিত নয় ঠিকই, কিন্তু একজন সুস্থ মানুষকেও কি যত খুশি মানসিক আঘাত দেওয়া যেতে পারে? কেউ জানে না, গীতার মনের মধ্যে কী চলছে।

গীতার হাতের এনগেজমেন্ট রিংটা খুলে ফেলার কথা শুধু কুলদীপ বলেনি, তার বাবা মাও প্রতিদিন তাড়া দিচ্ছিলেন। কুলদীপ চিরকালের মতন পঙ্গু, তার জীবনটা বাতিল, তার জন্য গীতার মতন একটি ব্রাইট মেয়ে জীবনটা নষ্ট করবে কেন? অবুঝ গীতাকে সঙ্গে নিয়ে তার বাবা-মা ডক্টর ওমপ্রকাশের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সেই ডাক্তারও বলেছিলেন, একজন মানুষের জন্য আর একজনের জীবন বরবাদ করার কোনো যুক্তি নেই। কুলদীপ বেঁচে থাকলেও সে পুরুষত্ব ফিরে পাবে না কখনো। সে কারুর প্রেমিক কিংবা স্বামী হবার যোগ্য নয় আর। তার সেবা-যত্নের প্রয়োজন থেকে যাবে বাকি জীবন, গীতা কি তার নার্স হয়ে থাকতে চায়? একজন প্রফেশনাল নার্সই তো সে কাজ ভালো পারবে।

গীতার চোখে চোখ রেখে ডাক্তার বলেছিলেন, প্রেম হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের ইমোশান। এই ক্ষেত্রে সেই ইমোশানটা দূরে থেকে পুষে রাখাই আপনাদের দুজনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। আমার মনে হয়, মিস শাকসেনা, আপনার ঐ আংটিটা ফেরত দিয়ে আসাই উচিত।

বাবা আর মা জ্বলজ্বলে চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, তবেই বুঝে দ্যাখ! এত বড় একজন ডাক্তার বলছেন।

গীতা অন্যদের কিছুতেই বোঝাতে পারে না, সে কি হেরে যাবে? কুলদীপকে সে ভালোবেসেছে। কুলদীপ কিছু বলার আগে সে নিজেই জানিয়েছিল সে কথা। রবি দত্তা আর কুলদীপ সিং, এই দুজনের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল দার্জিলিং-এ। কতদিন তারা একসঙ্গে বেরিয়েছে, তিনজনে একসঙ্গে ঘোড়ায় চেপে গেছে লেপচাজগৎ বাংলোয়, সেখানে পিকনিক করেছে। কুলদীপ ছিল একটু লাজুক, রবি অনেক বেশি উচ্ছল। সে চোখা চোখা কথাও বলতে পারে। একদিন রবি কিছুটা বীয়ার পান করে বেশি ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছিল, গীতার ঠোঁটের কাছে এগিয়ে এনেছিল ঠোঁট, সেদিন গীতা রবির মুখে তার হাত চাপা দিয়ে নরম গলায় বলেছিল, না, রবি, প্লীজ। তুমি আমার বন্ধু। আমি তোমাকে বন্ধু হিসেবেই চাই। আমি ভালোবাসি কুলদীপকে। তুমি কি তার জন্য রাগ করবে?

প্রথমে কুলদীপের কাছে নয়, রবির কাছে গীতা জানিয়েছিল কুলদীপের প্রতি তার ভালোবাসার কথা। এতদিন অব্যক্ত ছিল, সেই মুহূর্তে হঠাৎ বেরিয়ে এলো।

রবি কিন্তু রাগ করেনি। হেসে উঠে বলেছিল, আমি জানতাম। আমি কোনো প্রতিযোগিতায় জিততে পারি না। আই অ্যাম আ বর্ন লুজার। কুলদীপ ইজ আ লাকি ডগ।

তারপর থেকে সুন্দর বন্ধুত্ব ছিল রবির সঙ্গে। এভারেস্ট থেকে ফিরে আসার পর কুলদীপের সঙ্গে গীতার বিয়েতে কেমন উৎসব হবে, সে পরিকল্পনাও করে ফেলেছিল রবি। এখন কুলদীপ যুদ্ধে আহত হয়েছে, ভালোবাসা ফিরিয়ে নেবে গীতা।

কুলদীপ যে গীতাকে আংটি খুলে ফেলতে বলেছে, তাকে কাছে আসতে বারণ করেছে, তার মানে কুলদীপ স্বার্থপর হতে চায় না। সে ভালোবাসার সুযোগ নিয়ে চায় না গীতাকে বেঁধে রাখতে। কিন্তু গীতা যদি কুলদীপকে ত্যাগ করে, এই সুযোগে মুক্তি চায়, সেটা তার স্বার্থপরতা নয়? ভালোবাসা হেরে যাবে স্বার্থপরতার কাছে।

কিন্তু গীতা শেষ পর্যন্ত আর পারলো না। একদিকে বাবা-মায়ের চাপ, অন্যদিকে কুলদীপের কঠোর প্রত্যাখ্যান, হাসপাতালের বিধি-নিষেধ, এই সব মিলিয়ে সে উদভ্রান্ত হয়ে গেল। কয়েকদিন কাঁদলো বুক উজাড় করে, তারপর চলে গেল দিল্লি ছেড়ে।

কুলদীপ এসব কিছুই জানে না, সে মুখ ফুটে গীতার কথা জিজ্ঞেসও করবে না কারুর কাছে।

তবু প্রত্যেকদিন সকালবেলা তার একবার মনে হয়, গীতা কি না এসে পারবে? আবার গীতা এলে কোন কোন বাছা বাছা শব্দ প্রয়োগে সে গীতাকে ফিরিয়ে দেবে, সেগুলো কুলদীপ ভেবে রাখে। গীতার আত্মত্যাগের গরিমাটা চুপসে দিতে হবে। কিন্তু গীতা আর আসে না। কয়েকদিন পর কুলদীপ টের পায়, গীতার প্রতি তার ভালোবাসা কত তীব্র। তার শরীর নেই, অথচ ভালোবাসা আছে।

একদিন জয়দীপ সারিন এসে বললো, কুলদীপ তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে।

সেদিন কুলদীপের মেজাজ খুবই খারাপ।

কুলদীপের কাছে ছুটির দিন কিংবা কাজের দিনের কোনো তফাত নেই।

কিন্তু সেদিন সকাল থেকেই হাসপাতালে একটা ছুটি ছুটি ভাব। তারিখটা ছাব্বিশ জানুয়ারি। সকালবেলার নিয়মিত নার্স আসেনি, তার বদলে একজন পুরুষ অ্যাটেনড্যান্ট তার ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেছে। খাওয়া হয়ে যাবার পরেও এঁটো কাপ-প্লেট সরায়নি। ডক্টর রয় দু সপ্তাহ ধরে ছুটিতে আছেন, ডক্টর ওম প্রকাশও এলেন না, তার বদলে এলো একজন জুনিয়ার ডাক্তার।

কুলদীপ অনুভব করলো, আরও মাসের পর মাস হাসপাতালের বিছানায় পড়ে থাকলে তার প্রতি অবহেলা যে আরও বাড়বে, এসব যেন তারই ইঙ্গিত।

ছাব্বিশে জানুয়ারি দিল্লিতে বিরাট শোভাযাত্রা হয়। বিভিন্ন আর্মি ও সিভিলিয়ান গ্রুপ অংশ নেয়। প্রত্যেক রাজ্য সরকার ট্যাবলো টিম পাঠায়। দারুণ বর্ণাঢ্য ব্যাপার। দিল্লির বহু মানুষ সেই প্যারেড দেখতে ছুটে যায়।

এবারে এভারেস্ট অভিযাত্রী দলেরও একটা ট্যাবলো থাকবে। পর পর কয়েকটা ট্রাকে তৈরি করা হবে হিমালয়, মাঝখানে এভারেস্ট। এভারেস্ট অভিযানের পুরো দলটা উপস্থিত থাকবে সেই ট্রাকগুলোতে, রাওয়াত ফু দোরজি, লোগি, মোহন সিং, দামু ক্যাপটেন নরিন্দর সিং, শেরপা আংশেরিং, আরও অনেকে। কুলদীপ গতকাল খবরের কাগজে এই খবর পড়েছে। সেই দলে থাকবে না শুধু কুলদীপ সিং। রবিও কি থাকবে?

ইদানীং দিল্লিতে টেলিভিশান চালু হয়েছে। এই হাসপাতালের বড় হলটায় বসানো হয়েছে একটা টেলিভিশান সেট, সকালবেলা অনেকে সেখানে গিয়ে দেখেছে প্যারেড। কুলদীপকে কেউ সেই হলে নিয়ে যায়নি। তার কথা কারুর মনে পড়েনি। কুলদীপের নিজে থেকেও সেখানে যাবার সাধ্য নেই। একবার সে সকালবেলায় অ্যাটেন্ডান্টকে প্রায় বলে ফেলতে যাচ্ছিল যে আমাকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে ওখানে নিয়ে চলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে মুখ ফুটে বলেনি, এইটুকু অহংকার তার এখনো অবশিষ্ট আছে। সে অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরের সামনের দু পা কাটা ভিখিরি হয়ে যেতে পারবে না।

হ্যাঁ, প্রচণ্ড রাগ এবং অভিমান হয়েছিল ঠিকই। তবু কুলদীপ তা মুছে ফেলে শান্ত হতে চাইছিল। সে নিজেকে বারবার বোঝাবার চেষ্টা করছিল, সে আর এভারেস্ট অভিযাত্রী দলের কেউ নয়। এভারেস্ট-পর্ব তার জীবন থেকে শেষ হয়ে গেছে। ধরা যাক, সে মারা গেছে, তাহলে তো ঐ ট্যাবলোতে তার অংশ গ্রহণের কোনো প্রশ্ন ছিল না।

সেদিন সেই আত্মহত্যার চেষ্টার পর তার ঘর থেকে টেলিফোন সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। খাওয়ার সময় তাকে চামচ ছাড়া ছুরি-কাঁটা দেওয়া হয় না।

গীতা যখন আসতো, তখন সকালবেলা একবার তাকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে বারান্দায় ঘুরিয়ে আনা হতো। এখন মাও প্রতিদিন আসেন না। আজ দিল্লির সমস্ত ট্রাফিক বিপর্যস্ত, আজ তো তাঁর আসবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কেউ আজ আর কুলদীপকে বাইরে নিয়ে যায়নি, ক্যাবিনের মধ্যে কুলদীপ একা। শুয়ে শুয়ে একবার তার মনে হয়েছে, শোভাযাত্রাটা এখন কোথা দিয়ে যাচ্ছে, ইন্ডিয়া গেটের কাছে না কনট সার্কাসে? এভারেস্ট-ট্যাবলোটা কখন রাষ্ট্রপতির অভিবাদন নিল। ট্রাকের ওপর বসে রাওয়াত, বোগি, মোহন সিংরা কতরকম রঙ্গ-রসিকতা করছে নিজেদের মধ্যে? বোগি আর নরিন্দরের প্রচুর রসিকতার স্টক আছে। চোখের সামনে কুলদীপ যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল ওদের হাসি ঝলমল মুখগুলো। কিন্তু কুলদীপ ওদের ভুলে যেতে চায়। ভুলবে কি করে, ওদের সঙ্গেই যে কেটেছে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়।

কুলদীপের মেজাজ খারাপ থাকার আর একটা কারণ, দুপুরবেলা সে একজন জুনিয়র ডাক্তারের মুখে শুনেছে, তাকে শিগগিরই দিল্লি থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে বম্বের এক হাসপাতালে। দিল্লির এই হাসপাতালটা খুবই দামি, রাজনীতির ভি আই পিদের জন্য এর ক্যাবিনগুলো সংরক্ষিত থাকে সারা বছর। কুলদীপ এতদিন পর্যন্ত মোটামুটি একজন ভি আই পি ছিল, এখন তার মর্যাদা কমতে শুরু করেছে, তাই তাকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বম্বেতে।

দুপুরে আজ কুলদীপ কিছুই খায়নি, খাবারের ট্রে যেমন এসেছিল, সেরকমই ফিরে গেছে। খাবার মানে তো এক বাটি সুপ, খানিকটা মিষ্টি দেওয়া পরিজ আর একটা কলা আর কমলালেবু। এখনো তাকে কোনো শক্ত খাবার দেওয়া হয় না। প্রত্যেকদিন এ খাবার খেতে খেতে ঘেন্না ধরে গেছে।

জয়দীপ সারিন এলো বিকেলবেলা। পাজামা আর পাঞ্জাবি পরা, ছুটির দিনের ইনফরম্যাল পোশাক। মুখখানা হাসিমাখা। সারিন একজন ভালো বন্ধু। এই জয়দীপ সারিন নিজে এভারেস্ট অভিযানে যায়নি বটে, কিন্তু অভিযানের সে-ই প্রধান উদ্যোক্তা। ব্লাড প্রেসারের সমস্যা থাকায় সারিন বেশি উঁচুতে উঠতে পারে না, কিন্তু সারিন পাগলের মতন পাহাড় ভালাবাসে। এভারেস্ট অভিযানের সময় প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারের দিকে নজর ছিল সারিনের। সে তখন ভারত সরকারের ফিনান্স সেক্রেটারি। খরচের বাজেট নিয়ে সে অভিযাত্রীদের পক্ষে সরকারকে বুঝিয়েছে। সে সবসময় বলতো, ভারতের উত্তর দিক পাহারা দিচ্ছে হিমালয়। পৃথিবীর অন্য দেশ থেকে অভিযাত্রীরা এসে এভারেস্টের চূড়ায় উঠে যাচ্ছে। আর কোনো ভারতীয় দল

পারবে না ? ভারতীয়দের সাহস আর শৌর্য কি কিছু কম ? এবার পারতেই হবে।

ফিরে আসবার পর সারিনের আনন্দ ছিল দেখবার মতন। যেন এটা তার ব্যক্তিগত জয়। কাঠমাণ্ডুতে কুলদীপকে সে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছিল, তার মধ্যে ছিল খাঁটি বন্ধুত্বের উত্তাপ। সেই বন্ধুত্ব আজও নষ্ট হয়নি। সে মাঝে মাঝেই কুলদীপের কাছে আসে। তার আসার তো কোনো প্রয়োজন নেই, তাছাড়া সম্প্রতি তার পদোন্নতি হয়েছে, সে এখন প্রধানমন্ত্রীর ক্যাবিনেট সেক্রেটারি, সবসময় তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। তবু সে সপ্তাহে দু-তিনদিন আসবেই, এবং আসার পর কোনো রকম ব্যস্ততা বা তাড়াহুড়োর ভাব দেখায় না, একটা চেয়ারে গা এলিয়ে বসে কুলদীপের সঙ্গে গল্প করে।

সেদিন জয়দীপ সারিন যখন এলো, তখন কুলদীপের খুব এলোমেলো অবস্থা। মাথার পাগড়ি খোলা, দীর্ঘ চুল ছড়িয়ে আছে, দাড়িও আঁচড়ানো হয়নি, কেউ তাকে সেদিন দুপুরে শরীর স্পঞ্জ করে স্নান করিয়ে দেয়নি। কুলদীপ সাধারণত ফিটফাট থাকতে পছন্দ করে, সেদিন সেই অবস্থায় তাকে যেন চেনাই যাচ্ছিল না।

সারিন ঘরে ঢুকে চমকে গিয়ে বললো, এ কি ? তোমার এ অবস্থা কেন ?

কুলদীপ হেসে বললো, কেন, বেশ তো আছি।

সারিন সে কথায় কান না দিয়ে ক্যাবিনের বাইরে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকলো, নার্স ! নার্স !

সারিনকে অনেকেই চেনে, তার পদমর্যাদা জানে। একজন মধ্যবয়স্কা নার্স ছুটে এলো।

সারিন তাকে ধমক দিয়ে বললো, মিঃ কুলদীপ সিং-এর এই অবস্থা কেন ? জামাটা ময়লা, বদলানো হয়নি ! দেখেই বোঝা যাচ্ছে, স্নান করানো হয়নি। হাসপাতালটার এই অবস্থা হয়েছে নাকি ?

সারিনের ধমক-ধামক শুনে আরও দুজন নার্স এবং মেট্রন ছুটে এলো। নানা অজুহাত দেখিয়ে ক্ষমা চাইতে লাগলো তারা।

সারিন বললো, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। এইরকম চেহারার মিঃ কুলদীপ সিং-এর সঙ্গে আমি কথা বলতে পারবো না। আপনারা ওঁকে স্নান করিয়ে, তৈরি করে দিন, আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।

আধ ঘণ্টা ধরে দু-তিনজন নার্স কুলদীপকে দলাই মলাই করতে লাগলো। তার বিছানার চাদর, গায়ের চাদর পাল্টে আনা হলো ধপধপে নতুন চাদর।

পরানো হলো ইস্ত্রি করা জামা। মাথার চুল আঁচড়ে বেঁধে দেওয়া হলো পাগড়ি। নিজে থেকে পাগড়িটা বাঁধার ক্ষমতাও কুলদীপের নেই।

একজন নার্স রুম ফ্রেশনার ছড়িয়ে দিল, আর একজন ফুলভর্তি একটা ফ্লাওয়ার ভাস রেখে গেল।

সারিন এর পর ক্যাবিনে ঢুকে হৃষ্ট মুখে বললো, হ্যাঁ, এইবার ঠিক আছে। একজন শিখ সব সময় শিখের মতন থাকবে। একজন শিখের পোশাকের সঙ্গে তার চরিত্রের সঙ্গতি আছে। বাইরের লোকের সামনে মাথায় পাগড়ি ছাড়া কোনো শিখকে মানায় না।

কুলদীপ চুপ করে রইলো। তাদের পরিবার ধর্মনিষ্ঠ শিখ পরিবার। ছোটবেলা থেকে কুলদীপ প্রার্থনা করতে শিখেছে, গ্রন্থ সায়েব মুখস্ত করেছে। তার মা গুরু নানকের একটা ছবি রেখে গেছেন, সেটা এখনো রয়েছে কুলদীপের বালিশের নীচে।

কিন্তু এই কমাসে কুলদীপের মনে নানারকম প্রশ্ন জেগেছে।

ঈশ্বর সত্যিই আছেন? ধর্মের আচরণীয় সব নীতিগুলি মেনে চললে গুরুর আশীর্বাদ পাওয়া যায়। কুলদীপ তো তার ধর্মকে কোনোদিন অবজ্ঞা করেনি। তবু গুলমার্গ সীমান্তে যুদ্ধ থেমে যাবার পরেও শত্রুপক্ষের একটা গুলি লাগলো কেন তার ঠিক শিরদাঁড়াতেই? এতে ঈশ্বরের কোন অভিপ্রায় সিদ্ধ হলো? গুরুর স্নেহদৃষ্টি তখন কোথায় ছিল?

এভারেস্ট জয় করেছে বলে যাতে বেশি গর্ব না হয়, সেইজন্য একটা শিক্ষা দেওয়া হলো কুলদীপকে? গর্ব করার সময় কোথায় পেল কুলদীপ? পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে বক্তৃতা ও সম্বর্ধনা সভার আমন্ত্রণ এসেছিল, প্রথমেই যাবার কথা ছিল টোকিও-তে, কিন্তু সেসব ক্যানসেল করে কুলদীপকে যেতে হলো যুদ্ধে। একটা অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধ, অকারণ জীবনদান। নাঃ, ঈশ্বরের দয়া-টয়া এসব বাজে কথা।

কুলদীপ অবশ্য এই বিষয় নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করতে চায় না। তবে, এখন যখন মাঝে মাঝে অত্যধিক শ্বাস কষ্ট হয় কিংবা বুকটা জ্বলে যায়, তখনো সে ঈশ্বরের কাছে কোনো রকম প্রার্থনা জানায় না। তার বিশ্বাস চলে গেছে।

সারিন একটু একটু বাংলা জানে। কুলদীপও ছাত্র অবস্থায় কিছুদিন কলকাতায় ছিল বলে বাংলা খানিকটা বোঝে। তাই ওদের দেখা হলেই সারিন দুএক লাইন বাংলা বলে।

সারিন বললো, বল বীর, চির উন্নত মম শির। এই তো এখন তোমাকে আবার সেই বীর কুলদীপ সিং-এর মতন দেখাচ্ছে। আজকের প্যারেডের কথা শুনেছো ? তোমার ঘরে রেডিও নেই ? আরে ছি ছি ছি ছি, একটা রেডিও দেয়নি কেন এরা ? ঠিক আছে, আমি একটা পাঠিয়ে দেবো।

কুলদীপ বললো, না না, আমার রেডিও লাগবে না। আমি কাগজ পড়ি।

সারিন বললো, একটা টি ভি সেটও তো লাগিয়ে দিতে পারতো। জেনারাল ওয়ার্ডে একটা টি ভি সেট তো আছে, তুমি সেখানে গিয়ে প্রোগ্রামটা দেখলে না কেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে কুলদীপ বললো, কেমন হলো আজকের প্যারেড ? এভারেস্ট ট্যাবলোটা ভালো হয়েছিল ?

—খুব পপুলার হয়েছে। পাবলিক আগাগোড়া হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছে। অবশ্য তোমাকে সবাই খুব মিস করেছে। তুমিই তো ছিলে আসল হিরো। মাইকে তোমার নাম ঘোষণা করা হয়েছে বারবার।

—কুলদীপ সিং ইজ ডেড।

—কাম অন, কুলদীপ, তুমি জানো, এই ধরনের কথাবার্তা আমি পছন্দ করি না। মর্বিডিটি ইজ নট মাই কাপ অফ টি।

—সারিন তুমিও জানো, আমি পেপ্ টক পছন্দ করি না। আমার নাম ঘোষণা করা বা না করায় কি আসে যায় ?

—শোনো, কুলদীপ তোমার বন্ধুদের টিমের সকলের খুব ইচ্ছে ছিল, তোমাকেও ও ট্যাবলোতে নিয়ে যাওয়ার। তুমি হুইল চেয়ারে বসে থাকতে। কিন্তু আমি ডাক্তারদের সঙ্গে কনসাল্ট করেছি। কোনো ডাক্তার রাজি হননি। অতক্ষণ রোদ্দুরে বসে থাকা আর গাড়ির ঝাঁকুনি তোমার সহ্য হতো না।

—ডাক্তাররা রাজি হলেও আমি যেতাম না। কোনো মাউন্টেনীয়ার হুইল চেয়ারে অথর্ব অবস্থায় বসে পাবলিকের সামনে দেখা দিচ্ছে, এটা একটা অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ ব্যাপার।

—ওয়েল ঐভাবে যাওয়াটা তোমার পক্ষে ভালো দেখাতো না ঠিকই। সেইজন্য একটা অন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামনের সপ্তাহে অর্জুন পুরস্কারের সেরিমনি হবে রাষ্ট্রপতি ভবনে। তুমি নিজে সেখানে গিয়ে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণানের হাত থেকে পুরস্কার নেবে।

—এটারও কোনো প্রয়োজন নেই।

—এতে কোনো অসুবিধে হবে না। ঠিক টাইম হিসেব করে তোমাকে

অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাওয়া হবে রাষ্ট্রপতি ভবনে। সঙ্গে একজন ডাক্তার থাকবে। যখন তোমার নাম ডাকা হবে, তুমি হুইল চেয়ারে যাবে। প্ল্যাটফর্মের একদিকে স্লোপ করে দেব, যাতে তোমার চেয়ার উঠতে পারে। বেশি সময়ও তোমাকে থাকতে হবে না।

—থ্যাঙ্কস, সারিন। কিন্তু আমি যাবো না।

—কেন? যাবে না কেন? রাষ্ট্রপতির হাত থেকে তুমি পুরস্কার নেবে—

—হুইল চেয়ারে বসে আমি কোনো দিনই নিজেকে এভারেস্ট-বিজয়ী বলে পরিচয় দিতে পারবো না। ঐ পরিচয়টা আমি মুছে ফেলবো। আই অ্যাম আ উণ্ডেড সোলজার, দ্যাটস অল!

—তুমি উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছো কেন, কুলদীপ। কাম ডাউন; কাম ডাউন।

—তোমরা আমাকে নিয়ে অর্জুন পুরস্কারের ভড়ং করতে চাইছো, আবার আমাকে বম্বেতে নির্বাসনে পাঠাচ্ছো। এর পর কোথায় পাঠাবে, আন্দামানে?

—মাই গড! এসব তুমি কি বলছো, কুলদীপ! বম্বেতে নির্বাসন! ট্রাস্ট মি, দ্যাট নেভাল হসপিটাল ইজ ওয়ান অফ দা বেস্ট ইন দা কান্ট্রি। দিল্লিতে তোমার যতটা চিকিৎসা করানো সম্ভব, তা হয়েছে। কিন্তু এ চিকিৎসা শুধু মেডিকেশান। এবার তোমার ফিজিওথেরাপি এবং হিট ট্রিটমেন্ট দরকার। তার সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা আছে বম্বের ঐ হাসপাতালে।

—বুল শিট। দিল্লির হাসপাতালের এই ক্যাবিনটা নিশ্চয়ই কোনো ভি আই পি'র দরকার তাই না? সেই জন্য তোমরা আমাকে বম্বে সরিয়ে দিচ্ছো।

সারিন এবার হাসতে আরম্ভ করলো। সে প্রাণ খুলে হাসতে পারে। সমস্ত শরীর হাসিতে কাঁপিয়ে সে বললো, বম্বেতে নির্বাসন। তারপর কি বললে? আন্দামান?

কুলদীপ বললো, তা ছাড়া আর কী হবে? সরকার কতদিন আমার চিকিৎসা চালাবে? মাসের পর মাস হাসপাতালে শুয়ে আছি বলে আমার মাইনে অর্ধেক হয়ে গেছে। এর পর আরও কমবে। কোনোদিনই আর আর্মিতে যোগ দিতে পারবো না, আমাকে পেনশন ধরিয়ে দেওয়া হবে। সেই সামান্য টাকায় আমাকে আন্দামানের মতন কোনো জায়গাতেই গিয়ে থাকতে হবে নিশ্চয়ই। যতদিন বেঁচে থাকি।

চেয়ারটা আরও কাছে টেনে এনে সারিন বললো, এবার তোমাকে আসল কথাটা বলি। দেশের অবস্থা জানো তো? যুদ্ধ থামার পরেই প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাসকেন্টে গিয়ে হঠাৎ মারা গেলেন। তারপর একটা

পোলিটিক্যাল ক্রাইসিস চলছিল, কংগ্রেসের মধ্যে ইন-ফাইটিং প্রকাশ্যে এসে গিয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধী কি অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, তাও নিশ্চয়ই শুনেছো ? এতদিন কোনো কিছুই বলা যাচ্ছিল না। এখন খানিকটা স্টেবিলিটি এসেছে। আমি কাল প্রাইম মিনিস্টারের কাছে তোমার প্রসঙ্গ তুলেছিলাম। তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে সব শুনলেন। যুদ্ধ থেমে যাবার পরেও তোমার গায়ে গুলি লেগেছিল শুনে উনি এত দুঃখ করলেন, বিশ্বাস করো, ওঁর চোখ ছলছল করে উঠেছিল। উনি শিগগিরই তোমাকে একবার দেখতে আসবেন।

কুলদীপ চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, প্রধানমন্ত্রী এই হাসপাতালে আসবেন, সঙ্গে এক গাদা ক্যামেরাম্যান-জার্নালিস্ট আসবে, হাসপাতালে প্রচণ্ড হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে, অনেক লোক আমার ক্যাবিনে এসে উঁকিঝুঁকি মারবে। কিন্তু এতে আমার কি লাভ হবে বলতে পারো ?

সারিন নরম গলায় বললো, তুমি সব ব্যাপারেই এত সিনিক্যাল হয়ে যাচ্ছো কেন, কুলদীপ ? মিসেস গান্ধীকে আমি বলেছি, তোমার আরও চিকিৎসার জন্য তোমাকে স্টোক ম্যাণ্ডেভিল হাসপাতালে পাঠানো দরকার। মিসেস গান্ধী রাজি হয়েছেন।

এবার কুলদীপ খানিকটা চমকে গেল। এখানে থাকতে থাকতে সে ঐ হাসপাতালের নাম অনেকের কাছে শুনেছে। স্নায়ুর রোগ ও আঙ্গিক জড়তার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসার জায়গা হলো ইংল্যাণ্ডের স্টোক ম্যাণ্ডেভিল হাসপাতাল। সারা পৃথিবী থেকে লোকে সেখানে চিকিৎসার জন্য যায়। কিন্তু এসব চিকিৎসায় অনেকদিন সময় লাগে, খরচও হয় খুব, বড়লোকরাই শুধু যেতে পারে। তাও জায়গা পাওয়া যায় না। এক-দু' বছর আগে থেকে নাম লিখিয়ে রাখতে হয়।

কুলদীপ আস্তে আস্তে বললো, সেখানে আমাকে পাঠাবে, অত টাকা, ফরেন এক্সচেইঞ্জ.....দেবে কে ?

সারিন বললো, ফিনান্সে থাকতে আমি ফাইল মুভ করিয়ে রেখেছিলাম। এখন প্রধানমন্ত্রী রাজি হয়ে গেলে তো আর কোনো সমস্যাই নেই। বম্বেতে তোমাকে বেশিদিন থাকতে হবে না, মাসখানেকের মধ্যেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। চীয়ার আপ, কুলদীপ, স্টোক ম্যাণ্ডেভিলে গেলে তুমি সুস্থ হয়ে উঠবেই।

একটুক্ষণ চুপ করে সারিনের দিকে চেয়ে বসে রইলো কুলদীপ।

তারপর মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমার জন্য এতটা চেষ্টা করলে কেন, সারিন ?

সারিন আবার হেসে উঠে বললো, আমি মেয়ে হলে বলতাম, আই অ্যাম ইন

লাভ উইথ ইউ। তা তো নই, আই অ্যাম জাস্ট এ ফ্রেণ্ড। বন্ধুর জন্য কোনো বন্ধু কি এইটুকু করে না ?

একটু থেমে সারিন আবার বললো, তুমি ন্যাশনাল হিরো, আমাদের দেশের গর্ব। তোমাকে সুস্থ করে তোলার জন্য তোমার দেশের সরকার সব রকম চেষ্টা করবে না ?

ন্যাশনাল হিরো কথাটা শুনলেই কুলদীপ লজ্জা পায়। সে বললো, তোমরা রবির জন্য কতটা কি করেছো ঠিক করে বলো তো। রবি কেমন আছে, আমি জানি না। এতদিনের মধ্যে তার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগই হলো না।

সারিন বললো, মেজর রবি দত্ত ? তাকে এই হাসপাতাল থেকে....

সারিন কথাটা শেষ করতে পারলো না। এর মধ্যে একটা বড় দল ঢুকে এলো ক্যাবিনের মধ্যে। দশ-বারোজন, সকলের দাঁড়াবারই জায়গা নেই, বাইরেও রয়েছে আরও কয়েকজন।

এভারেস্ট টিমের সমস্ত বন্ধুরা। যারা আজ সকালের ট্যাবলোতে অংশ নিয়েছিল। হাসপাতালের নিয়ম-কানুন না মেনে তারা হৈচৈ, হাসাহাসি শুরু করে দিল। আর্মি জোকস। ডার্টি জোকস। যেন কুলদীপ ওদের সমান সমান, সে মোটেই অসুস্থ নয়।

লোগি আবার দুষ্টুমি করে বললো, মিঃ সারিন, এখানে বসে বীয়ার পান করা যায় না ? কতদিন কুলদীপের সঙ্গে গেলাসে গেলাস ঠেকিয়ে বীয়ার পান করা হয়নি।

কুলদীপ সকালবেলা ভেবেছিল, তাকে সবাই ভুলে গেছে। এখন বিকেলবেলা সব কিছু বদলে গেল। এত বন্ধুত্বের উত্তাপ, এমন আন্তরিকতা। কুলদীপ সাধারণত তার আবেগ বাইরে দেখাতে চায় না। তবু তার ঠোঁট কাঁপছে, চোখ ছলছল করছে। এখনো বন্ধুত্বের ওপর বিশ্বাস রাখা যায়।

সে নিজেকে দমন করার চেষ্টা করে রাওয়াতকে বললো, আজকের প্যারেড কেমন হলো বলো।

রাওয়াতকে সরিয়ে দিয়ে নরিন্দর বললো, ওঃ কি বলবো ! সারা রাস্তা ধরে দিল্লির প্রিটিয়েস্ট গার্লস, তারা ফ্লাইং কিস ছুঁড়ে দিচ্ছিল। ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছিল। ইউ শুড হ্যাভ বীন দেয়ার, ম্যান। কি শুধু শুধু বিছানায় শুয়ে আছো।

কুলদীপ জিজ্ঞেস করলো, মেজর রবি দত্ত ছিল না ? তোমরা তাকে ডাকনি ?

নরিন্দর উৎসাহে টগবগ করছিল। হঠাৎ থেমে গেল। অন্যদের দিকে

একবার তাকিয়ে বললো, না, রবি দত্ত ছিল না। সে দিল্লিতে নেই।

কুলদীপ বললো, রবি শেষ পর্যন্ত পীকে উঠতে পারেনি বলে তোমরা তাকে হেলাফেলা করছো? টিম স্পিরিটটাই আসল। রবির মতন টিম স্পিরিট সব সময় জাগিয়ে রাখতে আর কে পেরেছে? তা ছাড়া হি অলমোস্ট মেড ইট। আর একটুখানি বাকি ছিল।

মোহন সিং বললো, আমরা সবাই রবিকে অ্যাডমায়ার করি। হি ইজ আ গ্রেট গাই। কিন্তু রবি নিজের গ্রামে চলে গেছে। তাকে খবর দেওয়া যায়নি। খুব তাড়াতাড়ি সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হলো।

কুলদীপ বললো, রবি কি গ্রামে গিয়ে চাষ করছে নাকি? আর্মি ছেড়ে দিল?

লোগি জিজ্ঞেস করল, তুমি ইংল্যান্ডে কবে যাচ্ছ, কুলদীপ?

কুলদীপ বললো,এ খবরটা দেখছি সবাই আগে থেকে জানে। শুধু আমিই এই কিছুক্ষণ আগে প্রথম শুনলাম!

মোহন সিং বললো, মিস্টার সারিন রিপাবলিক ডে-তে তোমাকে একটা সারপ্রাইজ প্রেজেন্ট দেবেন ঠিক করেছিলেন।

সারিন বললো,না, না, আমি বিশেষ কিছু করিনি। প্রাইম মিনিস্টার নিজে আগ্রহ দেখিয়েছেন।

কুলদীপ বললো, ফরেন এক্সচেইঞ্জ খরচ করে বিদেশের হাসপাতালে যেতে হবে? আমরা আমাদের দেশে এরকম একটা হাসপাতাল খুলতে পারি না?

সারিন বললো, অনেকদিনের এক্সপারটাইজের ব্যাপার। আমরা সাধারণ হাসপাতালগুলোই ভালভাবে চালাতে পারি না।

মোহন সিংবললো,আমাদের মন্ত্রীরা যখন তখন বিদেশে যায়। তাদের জন্য কত ডলার, পাউন্ড খরচ হয়। তোমার জন্য আর এমনকি বেশি ফরেন এক্সচেইঞ্জ লাগবে? ওসব নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না, কুলদীপ। স্টোক ম্যান্ডেভিল হাসপাতালটার খুবই নাম শুনেছি। ওরা নাকি মিরাক্‌ল ঘটিয়ে দিতে পারে। ইউ উইল বী ফিট অ্যাজ আ ফিড্‌ল, কুলদীপ!

কুলদীপ বললো, আমি ও ধরনের মিরাকলে বিশ্বাস করি না। যুদ্ধ থেমে যাবার পরেও আমাদের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিল, এটাই কি মিরাক্‌ল নয়?

সারিন হাত তুলে বললো,নো সিনিসিজ্‌ম। নো সিনিসিজ্‌ম। উই আর অল অপটিমিস্ট! অসাধারণ অপটিমিস্ট না হলে কেউ হিমালয় জয় করতে পারে না। কুলদীপ, মনে রেখো, মনের জোরটাই আসল। মনের জোর না থাকলে কোনো চিকিৎসাতেই কাজ হবে না!

রাওয়াত বললো, কুলদীপের মনের জোর কতখানি, তা আমি জানি। ও যে-ভাবে একা একা রেজর্স এজ পার হয়ে সাউথ কলের কাছে পৌঁছেছিল, আই ডাউট আর কারুর পক্ষে তা সম্ভব কি না।

কুলদীপ এবার হাসতে হাসতে বললো, সারিন, আমার একটাই অনুরোধ রইলো। ইংল্যান্ডের ওই হাসপাতালে যদি আমি মরে যাই, তা হলে আমাকে ওখানে কবর দিও না। আমার বডিটা ফিরিয়ে এনে হিমালয়ের পায়ের কাছে কোথাও পুঁতে দেবার ব্যবস্থা কোরো, প্লিজ।

॥ ৭ ॥

পাঁচ সপ্তাহের মধ্যেই সব ব্যবস্থা করে কুলদীপকে তুলে দেওয়া হলো লন্ডনগামী বিমানে। দিল্লি বিমানবন্দরে অনেকে এসেছিল তাকে বিদায় জানাতে। এমনকি একজন মন্ত্রী পর্যন্ত। কুলদীপের মা এবং মামাও এসেছেন। কিন্তু গীতাকে সেখানে দেখা গেল না।

সরকারি ব্যাপার, কুলদীপের চিকিৎসার সব খরচ মঞ্জুর করা হয়েছে, কুলদীপের জন্য ক্লাব ক্লাসের টিকিট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কুলদীপের সঙ্গে যাওয়ার জন্য কোনো লোকের ব্যবস্থা হয়নি শেষ পর্যন্ত। কুলদীপ একা একা সামান্য নড়া চড়াও করতে পারে না, তার দেখাশুনো করবে কে? একজন ডাক্তারকে সঙ্গে পাঠাবার কথা উঠেছিল একবার, কিন্তু তার টিকিট কাটা হয়নি।

সারিন খুব লজ্জায় পড়ে গেল। অ্যাটেন্ড্যান্ট ডাক্তারের জন্য আলাদা টাকার স্যাংকশন ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট শেষ মুহূর্তেও ছাড়েনি। সরকারি লাল ফিতের সঙ্গে কত আর যুদ্ধ করা যায়। এই সব কথা প্রধানমন্ত্রীর কানেও তোলা যায় না, সময়ও আর নেই। আর দেরি করলে ওখানকার হাসপাতালে জায়গা পাওয়া যাবে না।

এয়ারপোর্টে একজন শিখ যুবক জানালো যে, সে লন্ডনে যাচ্ছে, সে কুলদীপ সিংকে একেবারে হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিচ্ছে। কুলদীপের মা সেই যুবকটার গায়ে হাত বুলিয়ে তাকেআশীর্বাদ জানালেন।

হুইল চেয়ারে করে কুলদীপকে তোলা হল বিমানে।

আকাশে ওড়ার পরে কুলদীপের মন ভারাক্রান্ত হয়ে রইলো। এভারেস্ট জয় করার পর সে ইংল্যান্ড, ইটালি আর সুইজারল্যান্ডের এক্সপ্লোরার্স ক্লাব থেকে

আমন্ত্রণ পেয়েছিল। হঠাৎ যুদ্ধে যোগ দিতে হলো বলে তার যাওয়া হয়নি। সসম্মানে বিদেশ যাত্রার কথা ছিল তার, এখন সে যাচ্ছে অথর্ব অবস্থায়। সরকারের দয়ায়।

জানলার বাইরে সাদা মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কুলদীপের চোখে অন্য দৃশ্য ভেসে ওঠে। চতুর্দিকে তুষারময় শিখর। এভারেস্টের চূড়ায় হাঁটু গেড়ে বসে পতাকা গেঁথে দিচ্ছে সে। প্রবল বাতাসে পতাকাটা উল্টে পড়ে যাচ্ছে এক-একবার, সবল হাতে কুলদীপ আবার টেনে তুলছে।

কুলদীপের ঘোর ভেঙে গেল শিখ যুবকটির ডাকে। তার নাম গুরমিত। সে চার-পাঁচজন তরুণ-তরুণীকে নিয়ে এসেছে কুলদীপের সঙ্গে আলাপ করাবার জন্য। তারা অটোগ্রাফ চায় কুলদীপের কাছে। ক্লাব ক্লাসের অন্যান্য যাত্রীরাও কুলদীপ সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

কুলদীপ তার হাত নাড়াতে পারে, বড় বড় জিনিস ধরে রাখতে পারে, কিন্তু দু' আঙুলে কলম ধরার মতন ক্ষমতা তার হয়নি। সে নাম সই করতে পারে না।

তরুণ-তরুণীরা বুঝতে পারলো না ব্যাপারটা, তারা পেড়াপিড়ি করতে লাগলো।

কুলদীপ কোনোক্রমে কলম ধরে চেষ্টা করলো সই দেবার। ব্যাঁকাতাড়া অক্ষর হতে লাগলো, কিছুই বোঝা যায় না। কুলদীপের মনে পড়লো, তার ঠাকুমা পঁচানব্বই বছর বয়সে এইভাবে লিখতেন।

অন্য একটা খাতা নিয়ে কুলদীপ চেষ্টা করলো ছবি আঁকার। এবার সে অনেকটা ফুটিয়ে তুললো একটা পাহাড়চূড়া। মেঘ। তার ওপর একটা পতাকা আঁকতে গিয়ে কলম খসে গেল হাত থেকে।

হঠাৎ তার কাশির দমক শুরু হলো। সাংঘাতিক কাশি, শিরা ফুলে উঠলো মুখের। চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

তাড়াতাড়ি ঘোষণা করে ডাকা হলো একজন ডাক্তারকে। পাওয়াও গেল একজন, সেই বাঙালি ডাক্তারটি বললো, আপনি তো কুলদীপ সিং, তাই না? আপনার কেসটা আমি জানি।

বাকি যাত্রার সময়টা কুলদীপ অসুস্থ হয়ে রইলো।

লন্ডনে পৌঁছবার পরও কুলদীপের ঘুম ঘুম ভাব। জীবনে প্রথম লন্ডনে আসা, তবু কুলদীপ কোনো উত্তেজনা বোধ করলো না। গুরমিত বছরে দু' তিনবার ইংল্যান্ডে যাওয়া আসা করে, এখানে তাদের ব্যবসা আছে, সে নিজেই

কুলদীপকে হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য তৈরি ছিল, কিন্তু হিথরো এয়ারপোর্টে ভারতীয় হাই কমিশনের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত।

স্টোক ম্যান্ডেভিল হাসপাতালের পরিবেশ ভারী সুন্দর। পেছন দিকে ঢেউ খেলানো ছোট ছোট পাহাড়, প্রচুর সবুজের সমারোহ। বাড়িটিকেও হাসপাতাল মনে হয় না, মনে হয় যেন বাগানবাড়ি। সেই বাগান ভরা অজস্র ফুল।

কুলদীপকে যে ঘরটায় রাখা হলো, সেটি একটি বেশ প্রশস্ত কক্ষ। একটা বড় খাট একদিকে, অন্যদিকে একটি আলমারি। এক পাশে একটি টেবিল, তার ওপরে টেলিফোন ও ফ্লাওয়ার ভাস। এক গোছা টাটকা ফুল সেখানে সাজানো।

সন্ধেবেলা পৌঁছবার পর কুলদীপ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর তার শরীরটা অনেকটা ঝরঝরে বোধ হলো। হঠাৎ ইচ্ছে করলো, খাট থেকে লাফিয়ে নেমে বাইরেটা একবার ঘুরে আসতে। তারপরই মনে পড়লো, হাঁটা-চলা দূরে থাক, তার তো নিজে নিজে খাট থেকে নামবারই ক্ষমতা নেই। কোমরের তলায় যে তার শরীরের কিছু আছে, সেটাই সে বুঝতে পারে না।

সে আবার চোখ বুজে রইলো।

ঘরে ঢুকলো দু'জন নার্স। তারা মনে করেছে, কুলদীপ এখনো ঘুমিয়ে আছে। তারা কথা বলতে লাগলো ফিসফিসিয়ে। একজন নার্স বেশ লম্বা, ব্লন্ড চুল, তার মুখে বেশ একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। অন্য নার্সটিকে সাধারণ নার্স নার্স দেখতে।

লম্বা নার্সটি বললো, আমি শুনেছিলাম, একজন ভারতীয় পেশেন্ট আসছে। একে তো দেখে মনে হচ্ছে আরব।

অন্য নার্সটি বললো, আরবরা অনেকেই ইংরিজি বলতে পারে না। কথা বলতে খুব মুস্কিল হয়।

লম্বা নার্সটি বললো, প্রথমেই ভাষা সমস্যা। আমি অবশ্য আকারে-ইঙ্গিতে ঠিক ম্যানেজ করে নিতে পারি।

কুলদীপ ওদের আলোচনা শুনে বেশ মজা পেল। অনেক দিন পর সে আপন মনে হাসলো।

নার্স দু'জন কুলদীপের জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখছে। লম্বা নার্সটি একবার মুখ ফেরাতেই কুলদীপ বললো, গুড মর্নিং। হাউ ডু ইউ ডু!

দু'জন নার্সই চমকে উঠলো। কুলদীপের ইংরিজি শুনে হাসি ফুটে উঠলো

তাদের মুখে।

লম্বা নার্সটির নাম মেরি স্টুয়ার্ট, কুলদীপের দেখাশুনোর ভার প্রধানত তার ওপরেই। এখানে একজন পেশেন্ট-এর কাছে ডিউটি বদল অনুযায়ী বিভিন্ন নার্স আসে না, একজন পেশেন্ট-এর দায়িত্ব মূলত একজন নার্সের ওপরেই থাকে, সে সেই পেশেন্ট-এর মানসিকতা বুঝে নেয়।

মেরির সঙ্গে একদিনের মধ্যেই কুলদীপের বেশ ভাব জমে গেল। মেরির ব্যবহার খুব সহজ, স্বাভাবিক। সে কথায় কথায় খুব হাসে। কুলদীপ একজন আর্মি অফিসার। যুদ্ধে আহত হয়েছে, কুলদীপের এই পরিচয়টাই শুধু মেরি জেনেছে। কুলদীপ যে এভারেস্ট জয়ী একজন বিখ্যাত মানুষ, সে পরিচয় মেরি জানে না, কুলদীপ যে নিজে থেকে জানাবে না, তা বলাই বাহুল্য!

মেরি প্রত্যেকদিন সকালে কুলদীপের ঘরের ফ্লাওয়ার ভাসে টাটকা ফুল সাজিয়ে রাখে। কুলদীপ সব বিলিতি ফুল চিনতে পারে না। তার আবার ছবি আঁকতে ইচ্ছে হলো। এক সময় সে ফুলের ছবি আঁকতে ভালোবাসতো।

ছবি আঁকার সরঞ্জাম তার মা বাক্সে গুছিয়ে দিয়েছিলেন। মেরির সাহায্য নিয়ে কুলদীপ সেগুলো বার করে ছবি আঁকতে বসলো। প্রথম একটা রেখা টেনেই তার মনে পড়লো, গীতা তার ছবি খুব পছন্দ করতো। কোথায় গীতা? সে সারা জীবনের মতন হারিয়ে গেছে। কুলদীপের সারা জীবন।

দু'দিন কেটে যাবার পর কুলদীপ জিজ্ঞেস করলো, আমার চিকিৎসা তো কিছু শুরু হলো না? কোনো ডাক্তারের সঙ্গেও দেখা হলো না এ পর্যন্ত।

মেরি হাসতে হাসতে বললো, তোমার চিকিৎসা তো শুরু হয়ে গেছে। তুমি টের পাওনি? তুমি যে ছবি আঁকছো, এটাই তো চিকিৎসা।

পরদিন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, ডাক্তার ওয়াল্‌শ কুলদীপকে পরীক্ষা করলেন। তাঁর ব্যবহারও বেশ প্রসন্ন ধরনের, মাঝে মাঝে ইয়ার্কির সুরে কথা বলেন। তিনি বললেন, বাঃ, আপনার অনেক কিছুই তো ঠিকঠাক আছে দেখছি। চোখ দুটো চমৎকার! দু'পাটি দাঁত নিখুঁত। কানে শুনতে পান ঠিকঠাক। আপনার মুখে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই, আপনি ভাগ্যবান। ব্রেনে কোনো ড্যামেজ নেই। আপনার হাত দুটোও ঠিক আছে। ওয়ান্ডারফুল।

কুলদীপ বললো, আমার হাতে পুরোপুরি জোর ফিরে পাইনি।

ডাক্তার ওয়ালশ বললেন, তাতেও চিন্তার কিছু নেই। আপনি বাগানে গিয়ে দেখবেন, আরও অনেকের হাতের অবস্থা আপনার চেয়েও খারাপ। কিন্তু

তারাও সেই হাতের ব্যবহার শিখছে। যে আগে কাঁটা-চামচ ধরতে পারতো না, সে এখন ভলিবল খেলে।

কুলদীপ জিজ্ঞেস করলো, আর আমার পা ?

ডাক্তার ওয়ালশ বললেন, দেখবো, কতটা কি করা যায়। শুনুন, আমাদের এটা যে সাধারণ হাসপাতাল নয়, তা নিশ্চয়ই জানেন ? এখানে আমরা কোনো মানুষকেই পঙ্গু মনে করি না। আপনার শরীরের যে-সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিখুঁত আছে সেগুলো পুরোপুরি ব্যবহার করতে শিখলেই স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায়। পায়ের অনেক কাজ হাত দিয়ে করা যায়। হাতের অনেক কাজ দাঁত দিয়ে করা যায়। যায় না ?

কুলদীপ বললো, দুটো পা অচল হলে সে মানুষ সারা জীবন ঘরে বন্দী হয়ে থাকবে ?

ডাক্তার ওয়ালশ বললেন, মোটেই না। এখন অনেক উন্নত ধরনের হুইল চেয়ার হয়েছে, তাতে ইচ্ছেমতন ঘোরা যায়। খানিকটা ট্রেইনিং নিলে আপনি গাড়ি চালাতেও পারবেন।

এখানে কুলদীপের দিন মন্দ কাটে না। পরিবেশটা অত্যন্ত সুন্দর। চার পাশে বাগান, দূরে ছোট ছোট টিলা। এ জায়গাটাকে সত্যি হাসপাতাল মনে হয় না। মনে হয়, একটা উন্নত ধরনের ট্রেনিং স্কুল। এখানে যারা চিকিৎসার জন্য এসেছে, তারা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য নানা রকম ট্রেইনিং নেয় খোলামেলা পরিবেশে। অনেক রকম খেলাধুলো, সাঁতার, ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের ব্যবস্থা আছে। কুলদীপ একদিন এখানে সাঁতার কাটারও চেষ্টা করলো। দুটো পা অবশ, তা সত্ত্বেও যে সাঁতার কাটা যায়, তা সে ভাবতেও পারেনি। এখানকার ইনস্ট্রাকটর দেখিয়ে দিল, দুটো পা বাঁধা থাকলেও সাঁতার কাটা সম্ভব।

তবু এক এক সময় দারুণ এক বিষণ্ণতা তাকে গ্রাস করে ফেলে। সে পঙ্গু, সে পরের ওপর নির্ভরশীল, এই ভাবেই কাটাতে হবে বাকি জীবন ? সে কোনো দিন আর নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে পারবে না ? কোনো মানুষই মরতে চায় না, সবাই বেঁচে থাকতে চায়, কিন্তু এই ভাবে বেঁচে থেকে লাভ কী ?

একটা কথা তার বারবার মনে পড়ে আর নিজের ওপর ধিক্কার জাগে। তার কোমরের তলা থেকে সব কিছুই অসাড়। তার কোনো যৌন ক্ষমতা নেই। সারা জীবন তার কোনো নারীর সঙ্গে সম্পর্ক হবে না ? তা হলে সে কি পুরুষ

মানুষ ? সবাই তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলে, শরীর কিছু নয়, মনটাই আসল। কিন্তু শুধু মানসিকভাবে কি জীবনের সব আনন্দ উপভোগ করা যায় ? মেরির সঙ্গে কুলদীপের বেশ একটা সুন্দর সম্পর্ক হয়েছে। মেরি প্রায়ই তার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করে, তার ব্যক্তিগত জীবনের কথাও বলে। খানিকটা হাসিঠাট্টা করতে গিয়েও কুলদীপ হঠাৎ থেমে যায়। একটা গ্লানিবোধ তাকে চেপে ধরে। সে যে পুরুষত্বহীন, তা তো মেরি জানে !

দেশের লোকজনের কথাও তার মনে পড়ে। মা, বাবা, এভারেস্ট অভিযানের বন্ধুদের কথা। রবির সঙ্গে কোনো যোগাযোগই হলো না। সে শুনেছে, রবি অনেকটা সুস্থ হয়ে দেশের বাড়িতেই রয়ে গেছে। যাবার আগে রবি তার সঙ্গে একবারও দেখা করতে এলো না ? ডাক্তাররা বুঝিয়েছে যে কুলদীপের পক্ষে এখন বেশি মানসিক উত্তেজনা ভালো না। রবি দেখা করতে এলে সে রকম সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু রবি তাকে একটা চিঠি লিখতেও পারে না ? রবির ব্যাপারে কি যেন একটা রহস্য আছে। রবি কি কোনো কারণে তার ওপরে অভিমান করেছে ?

বিদেশে চিকিৎসার জন্য সরকার বহু টাকা খরচ করছে কুলদীপের জন্য। এর বিনিময়ে সে দেশকে কি দিতে পারবে ? কিচ্ছু না ! নিজের সংসারের বোঝা, দেশের একটা বোঝা হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু অনেক সম্মানজনক নয় ?

এক সন্ধেবেলা কুলদীপ একটা বই পড়বার চেষ্টা করছে, এমন সময় মেরি প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে বললো, তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে আসছেন। আন্দাজ করতে পারো তিনি কে ?

কুলদীপ মুখ তুলে তাকালো। ইন্ডিয়ান হাই কমিশন থেকে কেউ কেউ মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। ভারতের একজন মন্ত্রী এ দেশে আসার পর সৌজন্যবশত কুলদীপকে দেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু মেরি তো কখনো এমন উত্তেজিত হয়নি।

কুলদীপের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে মেরি বললো, বিখ্যাত লোক। খবরের কাগজে কত ছবি দেখেছি, তাই দেখেই চিনতে পেরেছি। লর্ড হান্ট !

ঠিক তখনই দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন স্বয়ং লর্ড হান্ট।

মানুষের ইতিহাসে প্রথম যে দলটি এভারেস্টের চূড়ায় আরোহণ করতে সমর্থ হয়, লর্ড হান্ট ছিলেন সেই অভিযাত্রী দলের নেতা। তিনি নিজে শেষ পর্যন্ত চূড়ায় ওঠেননি, কিন্তু তাঁর নেতৃত্বেই যে অভিযানটি সার্থক হয়েছিল, তা

সকলেই জানে। বিশ্বের সমস্ত অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষ শ্রদ্ধা করে এই মানুষটিকে।

লর্ড হান্টের হাতে একটা বাস্কেট ভর্তি ফল। তাঁর মাথার চুলে পাক ধরেছে কিন্তু মুখে রয়েছে অসাধারণত্বের ছাপ। তিনি মৃদু হাসি মুখে, বিনীত ভাবে নিজের পরিচয় জানালেন।

তাঁকে সম্মান জানাবার জন্য কুলদীপ ধড়ফড়িয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল। সে ভুলে গিয়েছিল নিজের অবস্থা।

লর্ড হান্ট তার সামনে এসে বললেন, আমি কয়েকটা দেশ ঘুরতে গিয়েছিলাম। ভারতে গিয়ে তোমার কথা শুনলাম। তুমি একজন এভারেস্ট জয়ী, তোমাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি। লেডি হান্ট এই ফলগুলি পাঠিয়েছেন তোমার জন্য।

বিস্ময়ে মেরির চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। এভারেস্ট জয়ী? ভারতীয়রাও এভারেস্ট জয় করতে পারে? সে রকম একজন মানুষকে সে প্রতিদিন দেখছে?

লর্ড হান্ট কুলদীপদের দলের অভিযান বিষয়ে টুকিটাকি কথা জিজ্ঞেস করলেন। তারপর কুলদীপের আরোগ্য ত্বরান্বিত হবার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলেন এক সময়।

এর পর থেকে এই হাসপাতালের সকলের কাছে কুলদীপের সম্মান বেড়ে গেল। অনেকে ভিড় করে দেখতে এলো কুলদীপকে। যেন তাকে নতুন রূপে দেখছে।

রাত্তিরের দিকে একটু নিরিবিলি হলে মেরি ছেলেমানুষের মতন উচ্ছল হয়ে তাকে বললো, এভারেস্ট? মাই গড। আমাদের দেশে ন' হাজার ফিটের বেশি পাহাড় নেই। আর তুমি উঠেছিলে উনত্রিশ হাজার ফিট? এ কথা আগে বলোনি কেন? তুমি একজন এত বিখ্যাত অভিযাত্রী!

কুলদীপ হেসে বললো, কি বলবো? বলবো কি, আমি এমন একজন অভিযাত্রী, যে জীবনে আর কখনো কোনো পাহাড়ে পা দেবে না?

মেরি সে কথা গ্রাহ্য না করে আবার জিজ্ঞেস করলো, আমরা আনন্দের মুহূর্তে অনেক সময় বলি, on top of the World. তুমি সত্যি সত্যি on top of the World দাঁড়িয়েছিলে? সে আনন্দ নিশ্চয়ই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ? সেখান থেকে আকাশের তারাগুলো কেমন দেখায়? তুমি ভগবানের অনেক কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলে!

কুলদীপ ধীর গলায় বললো, সেই মানুষটা আর এখনকার আমি এক নই।

মেরি এবার কুলদীপের একেবারে গা ঘেঁসে দাঁড়ালো। নরম গলায় বললো, তুমি এখনো একজন অসাধারণ মানুষ।

কুলদীপ তার হাত ধরে একদৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

সে রাত্রে কুলদীপ স্বপ্ন দেখলো যে সে একটা হুইল চেয়ারে বসে বরফ ঢাকা পাহাড়ে চড়বার চেষ্টা করছে। তার পাশে রবি। রবির এক পায়ে বিশাল প্লাস্টার। অদ্ভুত এক যুগল। হঠাৎ এক সময় কুলদীপের হুইল চেয়ার গড়িয়ে পড়ে যেতে লাগলো নীচে, রবি তাকে ধরবার চেষ্টা করলো। কুলদীপ তবু গড়াচ্ছে গড়াচ্ছে—

ঘুমের মধ্যেই কুলদীপ ডেকে উঠলো, রবি! রবি!

পরদিন সকালে মেরি এসে দেখলো, কুলদীপ বিছানায় বসে বসে ছবি আঁকছে। সে উঁকি দিয়ে দেখে বললো, বাঃ! খুব সুন্দর হচ্ছে।

তারপর জিজ্ঞেস করলো, তুমি নিশ্চয়ই তুলুজ লোত্রেকের কথা জানো? বাচ্চা বয়সে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তার দুটো পা-ই জখম হয়। কিন্তু তুলুজ লোত্রেক কি সব অসাধারণ ছবি এঁকেছেন।

কুলদীপ বললো, ঐ তুলনা দিয়ে লাভ নেই। আমার বাচ্চা বয়েসে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। একটা স্টুপিড যুদ্ধে আমি আহত হয়েছি। আমি শখের ছবি আঁকি। বড় শিল্পী হবার প্রতিভা আমার নেই, তা আমি ভালো করেই জানি।

মেরি একটা ক্যাসেট প্লেয়ার চালিয়ে দিলো। বেজে উঠলো বিথোফেনের নাইন্‌থ সিমফনির স্বর্গীয় সুর।

ঘর গুছোতে গুছোতে মেরি বললো, এই অমর সঙ্গীত স্রষ্টা এক সময় কালা হয়ে গিয়েছিলেন, কানে কিছুই শুনতে পেতেন না।

কুলদীপ কোনো মন্তব্য করলো না।

মেরি একটু পরে আবার বললো, প্যারাডাইজ লস্ট লিখেছিলেন মিল্টন, তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

কুলদীপ এবার উত্ত্যক্ত ভাবে বললো, স্টপ ইট। স্টপ ইট! আমাকে কি ছেলেমানুষের মতন ভোলাবার চেষ্টা করছো? শিল্প-সঙ্গীত-সাহিত্য সৃষ্টির কোনো প্রতিভা আমার নেই, তা আমি ভালো করেই জানি। আমি ছিলাম একজন সোলজার এবং মাউন্টেনিয়ার, এই দুটি ক্ষেত্রে আমি কিছুটা কৃতিত্ব দেখিয়েছিলাম। এই দুটি ক্ষেত্রেই আমি আর ফিরে যেতে পারবো না। কেন ঐ সব কথা বলো!

মেরি তবু হেসে বললো, তুমি তো সত্যিই ছেলেমানুষের মতন আমার সঙ্গে ঝগড়া করছো। যাক গে, চলো, ফিজিও থেরাপির সময় হয়ে গেছে।

কুলদীপকে বিছানা থেকে নামাবার পর হুইল চেয়ারে বসিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাবার সময় মেরি আবার মৃদু গলায় বললো, তুমি দুটি ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলে। কিন্তু মানুষের জীবনে কি নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার খোলে না ?

॥ ৮ ॥

স্টোক ম্যাণ্ডেভিল হাসপাতালে ধরা বাঁধা রুটিন কিছু নেই। জোর জবরদস্তি নেই। যার যখন যেটা শিখতে ইচ্ছে হবে, সে সেটা শিখতে যাবে। যেদিন ইচ্ছে হবে না, সে দিন না গেলেও ক্ষতি নেই।

ফিজিও থেরাপি বিভাগে অনেক কিছু শেখানো হয়। তার মধ্যে কয়েকটিকে বলা যায় ব্যায়াম, যেমন সাঁতার কাটা, তীর ধনুক ছোঁড়া, প্যারালাল বারে দোলা ইত্যাদি। আরও কয়েকটি আছে, যেগুলিতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনার সঙ্গে সঙ্গে কিছু সৃষ্টিও করা যায়। নানা রকম হস্তশিল্পের ট্রেইনিং দেওয়া হয়। যেমন ফ্লাওয়ার ভাস, চামড়ার ব্যাগ, টেব্‌ল ল্যাম্প, ল্যাম্প শেড তৈরি।

তীর ধনুক ছোঁড়ায় কুলদীপ বেশ দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এতে হাতের জোর বাড়ে। কুলদীপ অনেক দূরের টার্গেট ঠিক বিদ্ধ করতে পারে। ইনস্ট্রাকটরদের সে চ্যালেঞ্জ করে, পর পর তিন বার সে একই জায়গায় তীর মারবে ! হ্যাণ্ডিক্রাফট্‌-এর ট্রেইনিং নিয়ে সে বেশ ভালো একটা টেব্‌ল ল্যাম্প বানিয়ে ফেলেছে।

এই সব কাজে কুলদীপ এক এক সময় বেশ উৎসাহ পায়। আবার এক এক সময় ঝিমিয়ে পড়ে। কখনো কখনো তার শ্বাস কষ্ট হয়। কুলদীপ ভাবে, সে কি যথেষ্ট মনের জোর আনতে পারছে না ?

একদিন বাথরুমে যেতে গিয়ে তার অসহ্য পেটের যন্ত্রণা হলো, সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

পরের দিনই ডাক্তার ওয়াল্‌শ জানালেন যে এক্স-রে করে দেখা গেছে, তার ব্লাডারে কিছু পাথর জমেছে। অবিলম্বে অপারেশন করতে হবে।

অপারেশনের কথা শুনে কুলদীপের ভুরু কুঁচকে গেল। তার সন্দেহ হলো, এবার অপারেশন করে তার পা বুঝি কেটে বাদ দেওয়া হবে। সেই সন্দেহের

কথা ডাক্তারকে জানাতেই তিনি বললেন, সে কি কথা ! পা বাদ দেবার কোনো প্রশ্নই উঠছে না।

তিনি কুলদীপকে এক্স-রে প্লেট দেখিয়ে সব বুঝিয়ে দিলেন। তবু কুলদীপ অবুঝের মতন বলতে লাগলো, আমাকে অজ্ঞান করা হবে নিশ্চয়ই। তখন যদি পা কেটে দেওয়া হয় ? আমি তা জানতেও পারবো না।

ডাক্তার বললেন, কারুর অমতে আমরা কোনো রকম অপারেশান করি না। আপনার ভয়ের কিছু নেই। পাথরগুলো বার করে না দিলে আপনার কষ্ট কমবে না।

কুলদীপ তবু রাজি নয়।

নিজের ঘরে ফিরে আসবার পর নার্স মেরি বললো, তুমি অপারেশান করাতে রাজি হওনি ? তোমার পা কাটা হবে, তুমি ভাবলে কী করে ? আমি ডক্টর ওয়াল্‌শের কাছ থেকে সব জেনে এসেছি। ব্লাডারে পাথর জমেছে বলেই তোমার মাঝে মাঝে পেট ব্যথা হয়, মাথা ঘোরে।

কুলদীপ বললো, আমাদের গ্রামে একটা ভিখিরি ছিল, যার দুটো পা ট্রেনে কাটা গিয়েছিল। আমাকে সেই অবস্থা করে দিও না !

মেরি কুলদীপের কাছে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে বললো, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না ? আমি কি মিথ্যে কথা বলে তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারি ?

কুলদীপ মেরির কোমর জড়িয়ে ধরে কাতর ভাবে বললো, হ্যাঁ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। (জীবনে অন্তত একজন কারুর ওপর বিশ্বাস রাখতে না পারলে তো বেঁচে থাকার কোনো মানেই হয় না।)

মেরি নিজেকে সরিয়ে নিল না। ক্লান্ত প্রেমিকের মতন কুলদীপ তার পেটের কাছে মাথাটা চেপে ধরলো।

পরদিন অপারেশান টেবিলে নিয়ে আসা হলো কুলদীপকে। ডাক্তার ওয়াল্‌শ তৈরি হচ্ছেন। একজন অ্যানেসথেটিস্ট ইঞ্জেকশান দিতে গেল কুলদীপকে। কুলদীপ একটা অদ্ভুত ফাঁকা গলায় বললো, একটু বেশি করে ডোজ দিন। যাতে আমার জ্ঞান আর ফিরে না আসে !

অ্যানেসথেটিস্ট থমকে গিয়ে ডাক্তারের দিকে তাকালেন।

ডাক্তার কাছে এসে বললেন, মিঃ কুলদীপ সিং, এটা একটা খুব সিম্‌পল অপারেশন। আপনি এতটা বিচলিত হচ্ছেন কেন ?

কুলদীপ বললেন, আপনি শুরু করুন।

ডাক্তার বললেন, আপনার যদি এখনো আপত্তি থাকে, সামান্য সন্দেহও থাকে, তা হলে আমি অপারেশন করবো না।

কুলদীপ বললো। আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি সমস্ত কাগজপত্র সই করে দিয়েছি। প্লিজ, ডক্টর, আপনার কাজ শুরু করুন।

অ্যানেসথেটিস্ট ইঞ্জেকশান দেবার পরেই আস্তে-আস্তে কুলদীপের জ্ঞান লোপ পেতে লাগলো।

সে দেখতে পেল এভারেস্টের চূড়া। সেখানে রয়েছে তিনজন। সে, রাওয়াত আর ফু দোরজি। কুলদীপ একটা গুরু নানকের ছবি বার করে গভীর শ্রদ্ধায় তাতে চুম্বন দিয়ে পুঁতে দিল বরফের মধ্যে। রাওয়াত এনেছে মা দুর্গার একটা ছবি। ফু দোরজি হাতে নিল গৌতম বুদ্ধের একটা ছোট্ট মূর্তি।

কুলদীপ বললো, হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ, আমরা তিন ধর্মের লোক আজ এখানে সমান!

ফু দোরজি বললো, এডমাণ্ড হিলারি সাহেব আগে এসে এখানেই কোথাও একটা ক্রশ পুঁতে গেছেন। খুঁজে দেখবো?

কুলদীপ বললো, না, না, তার দরকার নেই। ফু দোরজি, তা হলে সত্যিই আমরা পৃথিবীর চূড়া জয় করেছি? অ্যাঁ, সত্যি?

ফু দোরজি বললো, হাঁ, হাঁ, পেরেছি! আমরা পেরেছি! তবে সাহেব, এর চেয়েও উঁচু পাহাড় আছে।

কুলদীপ আর রাওয়াত দু' জনেই অবাক হয়ে তাকালো।

ফু দোরজি নিজের বুকে হাত বুলোতে লাগলো।

হঠাৎ প্রবল হাওয়া উঠে আর ওদের কোনো কথা শোনা গেল না। তুষার ঝড়ে ওরা অস্পষ্ট হয়ে গেল।

অপারেশানের পর কুলদীপের জ্ঞান ফিরে এসেছে। তাকে গরম হরলিক্স জাতীয় পানীয় একটু একটু করে খাওয়াচ্ছে মেরি। ডাক্তার ওয়াল্‌শ সেখানে এসে বললেন, এই পাথরগুলো কোথায় ছিল কল্পনা করতে পারেন? আপনার ব্লাডারে। Look at the debris you Collected from the top of Everest!

এই অপারেশানের কয়েকদিন পর থেকেই কুলদীপের অবস্থার বেশ উন্নতি হলো। সে ফিজিও থেরাপির সব কিছু ভালো ভাবে করতে পারে। সে একটা সুন্দর টেব্‌ল ল্যাম্প বানিয়েছে। তীর ধনুক ছোঁড়ায় সে এখন অনেককে প্রতিযোগিতায় ডাকে। টাইপ রাইটার নিয়ে সে এখন দারুণ স্পীডে টাইপ করে যায়। অনেককে চিঠি লেখে।

এখন কুলদীপ বাইরে যাবারও অনুমতি পেয়েছে।

লণ্ডনের শিখ সম্প্রদায়ের অনেকে তাকে নেমন্তন্ন করে। বিভিন্ন ক্লাবে সে বক্তৃতা দিতে যায়। লোকেরা তাকে নিয়ে যায় এবং রাত দশটার মধ্যে ফিরিয়েও দেয়।

একদিন মেরি জিজ্ঞেস করলো, কাল রবিবার একটা পিকনিকে যাবে ?

কুলদীপ বললো, পিকনিক ? কাদের সঙ্গে ?

মেরি ঠোঁট টিপে হেসে বললো, আর কেউ না। শুধু তুমি আর আমি।

কুলদীপ মেরির চোখের দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে রইলো। দু'জনে পিকনিক ? সে তো প্রেমিক-প্রেমিকারা যায়। মেরির ভাবভঙ্গি প্রেমিকারই মতন। প্রায়ই ঘনিষ্ঠ হয়ে গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়ায়। কুলদীপকে ও শুধু দীপ বলে ডাকে, বেশ মিষ্টি শোনায় সেই ডাক। মেরির একবার ডিভোর্স হয়ে গেছে, বাচ্চা-কাচ্চা কিছু নেই। ও প্রায়ই বলে, ইণ্ডিয়াকে ও ভালোবাসে, ওর বাবা-মা বেশ কিছুদিন ইণ্ডিয়াতে ছিল,খুব সম্ভবত ওর মা ইণ্ডিয়াতে থাকার সময়ই সন্তান-সম্ভবা হয়, তাই মেরির রক্তে ইণ্ডিয়ার প্রতি একটা টান আছে।

কুলদীপ অবশ্য ভাবে, তার প্রতি মেরি যে নিভৃত ঘনিষ্ঠ ভাব দেখায়, সেটা কি সত্যি ভালোবাসা ; না ভান ? চিকিৎসার অঙ্গ ? একজন পুরুষত্বহীন পুরুষকে কি কেউ জেনেশুনে ভালোবাসতে পারে ?

যৌন ক্ষমতা নেই, তবু যৌন বাসনা আছে কেন ? এক এক সময় মেরিকে জড়িয়ে ধরার জন্য তার মনটা আকুলি-বিকুলি করে। প্রত্যেকদিন সকালে মেরি যখন টাটকা সাজ পোশাক পরে আসে, তাকে ভারী সুন্দর দেখায়, কুলদীপের ইচ্ছে করে খাট থেকে লাফিয়ে নেমে গিয়ে তাকে আদর করতে। মেরির দেহের গড়ন চমৎকার, সাধারণ মেয়েদের তুলনায় সে বেশ লম্বা, কুলদীপ লম্বা মেয়েদেরই পছন্দ করে, মেরির কোমরটা সরু, নিটোল দুই বুক। কখনো মেরি ঝুঁকে দাঁড়ালে তার স্তনের রেখা দেখা যায়। সেদিকে কয়েক মুহূর্ত লোভীর মতন তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নেয় কুলদীপ। মনে মনে সে যে কতবার মেরিকে চুমু খেয়েছে, তা যদি মেরি জানতো।

কেন এমন হয় ? শরীর অক্ষম, অথচ শারীরিক মিলনের জন্য তীব্র টান। কুলদীপ যুবক হয়েও যুবক নয়। এর যন্ত্রণা অন্য কেউ বুঝবে না।

হাসপাতালের গাড়ি নয়, মেরির নিজস্ব গাড়ি আছে, সেই গাড়িতেই ওরা বেরিয়ে পড়লো রবিবার সকালে। হুইল চেয়ারটা রাখা হলো পেছনে, কুলদীপ বসলো সামনে। মেরির পাশে। কুলদীপের ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে, কিন্তু

তার পা আর কখনো ক্লাচ, ব্রেক, অ্যাক্সিলেটর ছোঁবে না

স্টোক ম্যাণ্ডেভিল হাসপাতালটা আইলসবেরি-তে। সেখান থেকে ওরা চললো ওয়েলস-এর দিকে। ছোট ছোট পাহাড়ের ওপর দিয়ে পথ, এক একটা গ্রামকে মনে হয় যেন হিল স্টেশন। আগের রাত্রে প্রচুর তুষার পাত হয়েছে, তাই টিলাগুলোর চূড়া বরফে ঢাকা। এভারেস্ট থেকে নেমে আসার পর কুলদীপ এই প্রথম বরফ মাখা পাহাড় দেখলো। তার বুকটা খালি খালি লাগলো। সে আগে ইচ্ছে করলে এক দৌড়ে এই সব এক রত্তি পাহাড়ের ওপরে উঠে যেতে পারতো!

মেরি বললো আমাদের এই পাহাড়গুলো তোমার খুব ছোট ছোট লাগছে, তাই না?

কুলদীপ বললো, ইংলিশ কান্ট্রি সাইড ভারী সুন্দর। যেখানে যেখানে বরফ জমেছে, সেখানে ছাড়া আর সব কী দারুণ সবুজ আর ঝকঝকে ছবির মতন বললে অর্ডিনারি শোনায়, কিন্তু ছবির মতনই বলতে ইচ্ছে করে।

মেরি বললো, মাউন্ট এভারেস্ট! শুনলেই গা-টা ছমছম করে। আচ্ছা, আমি অনেক জায়গায় পড়েছি, এভারেস্টে উঠলে, ওঠার আগেই, পঁচিশ হাজার ফিট পার হবার পরেই মানুষের চরিত্র নাকি অনেক পাল্টে যায়, এটা কি সত্যি? তুমি সে রকম কিছু অনুভব করেছিলে।

কুলদীপ বললো, হ্যাঁ, অনুভব করেছি। কিন্তু সেই অনুভূতিটা বোঝাবার মতন ভাষা আমার জানা নেই।

মেরি বললো, আচ্ছা, দীপ, আর একটা ব্যাপার আমি তোমার কাছে জানতে চাই। হিমালয়ের এক একটা বড় বড় চূড়ার নাম মাকালু, লোতসে, কানচুন...কানচুন কি যেন।

—কাঞ্চনজঙ্ঘা।

—হ্যাঁ, কি চমৎকার সব স্থানীয় নাম। শুধু মাউন্ট এভারেস্টের নাম একজন ব্রিটিশ অফিসারের নামে কেন? এটা আনফেয়ার। তোমরা এই নামটা বদলে একটা ইন্ডিয়ান নাম রাখোনি কেন?

—এভারেস্ট যে একজন ব্রিটিশ অফিসারের নাম, তা আর এখন ক'জন মনে রেখেছে? এভারেস্ট নামটার মধ্যেই বেশ একটা গাম্ভীর্য আছে না? নামটা বেশ মানিয়ে গেছে। সারভে অফ ইন্ডিয়ার সেই ডিরেক্টর জেনারেলের নাম যদি স্মিথ কিংবা স্ট্যানলি হতো, তা হলে নিশ্চয়ই মানাতো না।

—চূড়াটা যখন আবিষ্কার হয়, তখন মিঃ এভারেস্ট ইন্ডিয়ার সার্ভে

ডিপার্টমেন্ট থেকে রিটায়ার করেছিলেন, তবু কেন ওঁর নাম রাখা হলো ?

—চীফ কমপিউটার যখন বুঝতে পারলেন না তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু চূড়াটাকে খুঁজে পেয়েছেন, তখন ওটার নাম ছিল পিক ফোরটিন। তারপর তাড়াহুড়ো করে সার্ভে অফিসের আগেকার বস্ মিঃ এভারেস্টের নামটা দিয়ে দেওয়া হয়। নিশ্চয়ই উনি ভালো লোক ছিলেন।

—তবু ইন্ডিয়ান পাহাড়ের ইন্ডিয়ান নাম হওয়া উচিত।

মাউন্ট এভারেস্ট তো শুধু ইন্ডিয়ায় নয়। বরং বলতে পারো, খানিকটা নেপালে, খানিকটা চায়নায়। তবে, আমি যতদূর জানি, সার্ভে অফিস থেকে পরে চেষ্টা করা হয়েছিল, যদি কোনো স্থানীয় নাম আগে থেকেই আছে এমন জানা যায়, তা হলে এভারেস্টের বদলে সেই নামই রাখা হবে। সে জন্য কমিটিও হয়েছিল। ইন্ডিয়ায় আর নেপালে কয়েকটা নাম শোনাও গিয়েছিল, কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গিয়েছিল, সেগুলো ঠিক এভারেস্টের নাম নয়। যেমন একটা নাম ছিল গৌরীশঙ্কর।

—কি নাম বললে ?

—তোমার পক্ষে উচ্চারণ করা শক্ত। গৌরীশঙ্কর। এই নামের দাবিটাই জোরালো ছিল। কিন্তু গৌরীশঙ্করও কাছাকাছি অন্য একটা চূড়ার নাম। মজা কি জানো, মেরি, খুব কাছে না গেলে বোঝা যায় না এভারেস্টের বিশালত্ব। একটু দূর থেকে অন্য চূড়াগুলোকেই বেশি বড় দেখায়। সার্ভে রিপোর্টের আগে এভারেস্টকে কেউ পাত্তা দেয়নি। কাঞ্চনজঙ্ঘাকেই সবচেয়ে বড় বলা হতো।

—আরও বলো, আরও বলো, দীপ। তোমার কাছ থেকে এভারেস্টের গল্প শুনতে আমার খুব ইচ্ছে করে। তোমরা তো একটা টিম মিলে উঠেছিলে। উঠতে উঠতে কখনো তুমি একা হয়ে গিয়েছিলে ?

—সবচেয়ে কঠিন সময়টাতেই আমি একা ছিলাম !

রাস্তার ধারে ধারে ছোট ছোট পাব। ঘোড়া চালিয়ে যাচ্ছে কেউ কেউ। সেই সব অশ্বারোহীদের তেজী মূর্তি দেখে কুলদীপের মনে পড়লো, দার্জিলিং-এ সে, রবি আর গীতা.....

'লায়ন্স ডেন' নামে একটা পাব দেখে কুলদীপ বললো, বেশ মজার নাম তো। ইংল্যান্ডের কত পাবের গল্প শুনেছি।

মেরি বললো একটা পাবে যাবে ? চলো না। একটুখানি বসে যাই।

কুলদীপ বললো, না। ওখানে ঢুকলে সবাই আমার দিকে তাকাবে।

লোকের চোখ থেকে দয়া আর করুণা ঝরে পড়বে। তবে, আজ একটু বীয়ার খেতে ইচ্ছে করছে।

গাড়ি থামিয়ে মেরি বীয়ার কিনতে চলে গেল। হুইল চেয়ার ছাড়া এমনি গাড়িতে বসে থাকলে কুলদীপকে কেউ পঙ্গু বলে বুঝতেই পারবে না। মনে হবে একজন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পুরুষ।

একটা টিলার পাশে একটা হোটেল। তার পাশ দিয়ে একটা নির্জন রাস্তা। আবার রাস্তা ছেড়ে মেরি সেই সরু রাস্তাটায় গাড়ি ঘোরালো। তারপর ঘুরতে ঘুরতে উঠে এলো টিলাটার একেবারে ওপরে।

সেখানে রয়েছে শুধু দুটি ছাউনি দেওয়া বেঞ্চ। আর কিছু না! মানুষ জনের চিহ্নমাত্র নেই। এখান থেকে বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়। ডান পাশের একটা হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে, সেগুলোকে মনে হচ্ছে ডিঙ্কি টয়। একদিকে ফসলের খেত। তার একপাশে একটা পুরনো আমলের কাসল, ঠিক যেন রূপকথার রাজবাড়ি।

মেরি বললো, এই জায়গাটা কেমন বেছেছি বলো?

কুলদীপ বললো, আউট অফ দিস ওয়ার্ল্ড! স্বপ্নের মতন।

মেরি বললো, তুমি হিমালয়ে দারুণ দারুণ সব সুন্দর জায়গা দেখেছ। তবু আমার কাছে এ জায়গাটা.....

কুলদীপ বললো, কোনো সুন্দরের সঙ্গেই অন্য সুন্দরের তুলনা চলে না। তুমি কখনো সন্ধেবেলায় মরুভূমি দেখেছো? আমি দেখেছি, রাজস্থানে, অপূর্ব সুন্দর। তা দেখে তো আমার মনে হয়নি, হিমালয়ের বরফমাখা চূড়া আরও বেশি সুন্দর!

মেরি গাড়ি থেকে হুইল চেয়ারটা নামালো, খুব যত্ন করে তাতে বসিয়ে দিল কুলদীপকে। একবার তার বুকের সঙ্গে ছুঁয়ে গেল কুলদীপের মুখ, মেরি তাতে মিষ্টি করে হাসলো।

হুইল চেয়ারটা ঠেলে ঠেলে মেরি নিয়ে এলো এক জায়গায়, সেখান থেকে পাহাড়টা একেবারে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে নীচে নেমে গেছে। এখানে কেউ যদি দৌড় শুরু করে, তা হলে কয়েক হাজার ফিটের আগে থামতে পারবে না। নীচে গিয়ে আছড়ে পড়বে।

একটা বীয়ারের ক্যান খুলে কুলদীপকে দিল মেরি, নিজেও নিল একটা। তারপর বললো, আমি ভেবেছিলাম, যতই ছোট হোক তবু পাহাড়ে এলে তোমার ভালো লাগবে। তুমি খুশি হয়েছো?

কুলদীপ বললো, আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ, মেরি। গুলি লাগার পর থেকে এত ভালো আমার আর কোনো দিন লাগেনি!

মেরি পরে আছে একটা শরতের আকাশ-রঙের কোট, মাথায় চুল একটু একটু উড়ছে, মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল। কুলদীপের ঠাণ্ডা লেগে যাবার ভয় আছে বলে তাকে পরানো হয়েছে জ্যাকেটের ওপরে ওভারকোট দু' হাতে দস্তানা। সে ডান হাতের দস্তানা খুলে মেরির একটা হাত ধরলো। মেরি সেই হাতে একটুখানি চাপ দিল।

কুলদীপ বললো, তুমি আমার চেয়ার ধরে পেছনে দাঁড়িয়ে আছো কেন, সামনে এসো। তোমাকে দেখি।

মেরি সামনে এসে চেয়ারটার একটা হাতল ধরে রইলো। কুলদীপ প্রবল তৃষ্ণার্তের মতন পান করতে লাগলো এই সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী তরুণীটির শারীরিক রূপ।

মেরি একটু লজ্জা পেয়ে বললো, আমি স্যাণ্ডউইচ এনেছি। আইসক্রিম আছে, তোমার যখন খিদে পাবে বলবে, দীপ, আমাদের হাতে অনেক সময় আছে।

কুলদীপ বললো, মেরি, তুমি আমার আগে অন্য আরও পেশেণ্টদের এনেছো এখানে?

মেরি চমকে ফিরে তাকালো। ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য হয়ে গেল তার মুখ। কয়েক মুহূর্ত সে কোনো কথা বলতে পারলো না।

কুলদীপ তীব্র চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

অত্যন্ত আহত হয়ে মেরি ভাঙা ভাঙা গলায় বললো, এটা কি খুবই নিষ্ঠুরতা হলো না? এরকম সময় এই প্রশ্ন করার কোনো মানে হয়?

—আগে আর কোনো পেশেণ্টের সঙ্গে এসেছো? উত্তর দাও?

—আমি কি সব সময় তোমার সঙ্গে পেশেণ্টের মতন ব্যবহার করি? আমি এসেছি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে। আজ আমার ছুটির দিন।

মেরি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো চেয়ারটার সামনে। কুলদীপের উরুতে দু'হাত রেখে ব্যাকুল ভাবে বললো, দীপ, দীপ, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছো?

অন্য সময় হলে কুলদীপ ঝুঁকে দুহাত দিয়ে মেরির মুখখানা ধরে আদর করতো। কিন্তু এখন সে অনড় হয়ে চোখ বুঁজে ফেললো। তার মুখখানা অসম্ভব কুঁকড়ে গেল, বীভৎস রূপ নিল। যেন ভেতর থেকে সাঙ্ঘাতিক কোনো যন্ত্রণা তার মুখের চামড়া ভেদ করে বেরুতে চাইছে।

মেরি আবার চমকে উঠলো। এবার ভয় পেয়ে গিয়ে বললো, কি হলো, দীপ ? তোমার শরীর খারাপ লাগছে ? কষ্ট হচ্ছে কোথায় ?

দু'বার মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে চোখ মেলে তাকালো কুলদীপ। খুব ভেতর থেকে একটা খসখসে গলায় বললো, না, আমার কষ্ট হচ্ছে না। কিংবা কি জানি, এটা কষ্ট না আনন্দ ! একটা তীব্রতা, আমি সইতে পারছি না, ইট ইজ টু মাচ ফর মি !

মেরি বললো, আমরা এখন ফিরে যাবো ?

দু হাত দিয়ে মুখটা ঘষে রেখাগুলো মুছে ফেললো কুলদীপ। তারপর অনেকটা স্বাভাবিক গলায় বললো, মেরি। এত সুন্দর এই জায়গাটা, তুমি আমার কাছে রয়েছো। এর থেকে ভালো আর কী হতে পারে ? এর থেকে আর বেশি কিছু আমি প্রত্যাশা করতে পারি না। এই ভালোলাগাটা এখানেই শেষ করে দিলে হয় না ? আমার জীবনে আর কিছু পাবার নেই। আই অ্যাম ফিনিশ্‌ড ! শুধু শুধু এই অস্তিত্বটাকে আর আঁকড়ে থেকে কি লাভ ? এখান থেকে যদি গড়িয়ে পড়ে যাই,একটা পাহাড়ের কোলে মৃত্যু হলেই আমি সবচেয়ে খুশি হবো।

—কী পাগলের মতন কথা বলছো, দীপ !

—না। আমি পাগল নই। আমার মাথা সম্পূর্ণ সুস্থ আছে, সেইজন্যই তো এত ঝঞ্ঝাট। আমার মতন মানুষের আর বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। তুমি আমাকে এখানে মরতে দাও, মেরি !

—তুমি দূরে একটা ঝরনার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছো ?

—আমাকে ছেলেমানুষের মতন ভোলাবার চেষ্টা কোরো না। যাস্ট গীভ মি আ পুশ ! আমি গড়িয়ে নেমে যাই !

—ছেলেমানুষেরা অনেক কিছু বোঝে। বয়স্করাই বেশি অবুঝ হয়। আমি নার্স, আমি সব সময় বেঁচে থাকার দিকে। আমি মৃত্যুর কথা শুনবো কেন ?

—তুমি স্বীকার করলে, তুমি এখনো নার্স। ইউ আর অলওয়েজ আ নার্স। ওয়েল, এখন আমার নার্সের কোনো দরকার নেই। আমার সামনে থেকে সরে যাও, লিভ মি অ্যালোন ! আমি নিজেই চেষ্টা করছি। তোমার কোনো দায়িত্ব থাকবে না। তুমি বলবে, ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাকসিডেন্ট ! পিওর অ্যান্ড সিম্‌প্‌ল অ্যাকসিডেন্ট।

মেরি উঠে দাঁড়িয়ে শক্ত করে ধরে রইলো হুইল চেয়ারটা।

কুলদীপ জোর করে দু' হাত দিয়ে চাকা ঘুরিয়ে সামনে এগোতে চাইলো।

চিৎকার করে বলতে লাগলো, লিভ মি অ্যালোন ! লিভ মি অ্যালোন !

মেরি হুইল চেয়ারটার মুখ ঘুরিয়ে ফেললো। কুলদীপ আটকাবার চেষ্টা করেও পারলো না। মাটিতে যে পা ছোঁয়াতে পারে না, সে কি করে আটকাবে !

চেয়ারটাকে গাড়ির কাছে এনে একটা দরজা খুলে ফেললো। তারপর খানিকটা কঠোর গলায় মেরি বললো, তোমাকে গাড়ির মধ্যে যেতে হবে, দীপ। প্লিজ ডোন্ট মেক ইট হার্ড ফর মি !

একটা মেয়ের সঙ্গেও গায়ের জোরে পারবে না কুলদীপ। মেরি তাকে একটা ছোট্ট ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারে। আর প্রতিরোধ করে কোনো লাভ নেই। মেরি দু' হাতে তাকে উঁচু করে তুলে বসিয়ে দিল গাড়ির মধ্যে। তারপর আপন মনেই বললো, লেটস গো ব্যাক।

মেরি খাবার দাবার বানিয়ে এনেছিল, কিছুই খাওয়া হলো না। অপরূপ একটা জায়গা, চমৎকার ওয়েদার, গ্লোরিয়াস সানশাইন, সব নষ্ট হয়ে গেল। গাড়ি স্টার্ট দেবার পর ভাবলেশহীন মুখে সামনের দিকে চেয়ে আছে মেরি, কুলদীপের দিকে একবারও তাকাচ্ছে না।

একটু পরে কুলদীপ বললো, আই অ্যাম সরি। আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি !

মেরি বললো, ইট্‌স অল রাইট। আমি যদি কোনো ভাবে তোমাকে আঘাত দিয়ে থাকি, সে জন্য দুঃখিত।

কুলদীপ বললো, জানি না, আমার মাথায় হঠাৎ কি চাপলো ! আমার ইমোশানের ওপর আমার নিজেরই কোনো কন্ট্রোল নেই। আমার মনে হলো, এই ভালোলাগাটুকু নিয়ে আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাই—

মেরি আর কিছু বললো না।

খানিক বাদে কুলদীপ আবার বললো, তোমার ছুটির দিনটা আমি স্পয়েল করে দিলাম। চলো, আবার ওখানে ফিরে যাই। আমাদের পিকনিকটা হলো না।

মেরি এবার মুখ ফেরালো কুলদীপের দিকে। বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো একটুক্ষণ। ইংরেজ মেয়েরা সাধারণত টেমপারামেন্টাল হয়। একবার মুড নষ্ট হয়ে গেলে একটু ক্ষণের মধ্যেই আবার তা পুনরুদ্ধার করতে পারে না। নার্স হলেও মেরি একজন নারী।

ভেতরের আলোড়ন দমন করে সে শুধু বললো, আমার মনে হয়, এখন আমাদের ফিরে যাওয়াই ভালো।

কুলদীপ বললো, আমাকে আর একটা বীয়ার দাও !

মেরি বললো, ডক্টর ওয়াল্‌শকে জিজ্ঞেস করতে হবে। তোমার বেশি বীয়ার পান করা উচিত কিনা আমি জানি না।

বাকি পথ ওরা দু' জনে আর একটাও কথা বললো না।

পরদিন কুলদীপ যখন শান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে বই পড়ছে, মেরি একটা ওষুধ খাওয়াতে এসে তার কাছ ঘেঁসে দাঁড়ালো।

সকালবেলা ব্রেকফাস্টের সময় মেরি আসেনি, অন্য একজন দিয়েছে। কুলদীপ ভেবেছিল, কালকের ঘটনার পর মেরি আর আসবে না। অন্য নার্স ডিউটি দেবে। কিন্তু এখন অন্যান্য দিনের মতনই একটা তাজা, ঝলমলে ভাব নিয়ে ঘরে ঢুকলো মেরি, বললো, গুড মর্নিং, দীপ। তোমাকে আজ বেশ ব্রাইট দেখাচ্ছে।

যেন আগের দিন কিছুই হয়নি। আগের দিনের কথা একবারও উল্লেখ করলো না। কুলদীপই এখনো অপরাধ বোধে ভুগছে। ওষুধ খাইয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মেরি। আবার ফিরে এলো একটু পরে। দাঁড়ালো কুলদীপের শিয়রের কাছে।

খুব নরম গলায় মেরি বললো, কুলদীপ, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?

কুলদীপ বই ছেড়ে মেরির দিকে তাকালো।

মেরি বললো, তুমি যখন এভারেস্টে উঠেছিলে, খুব কষ্ট হয়েছিল নিশ্চয়ই। একবারও ইচ্ছে করেনি ফিরে যেতে ? মনে হয়নি, থাক আর দরকার নেই ?

কুলদীপ বললো, একবার কেন, অসংখ্যবার মনে হয়েছে এ রকম ! খালি মনে হতো, আর কত দূর ? আর কত দূর ? অক্সিজেন ফুরিয়ে গেছে, এক একটা চিমনি থেকে গড়িয়ে পড়ে গেছি, তখন মনে হয়েছে, ফিরে যাবো। নেমে গেলে কত আরাম। কি হবে ওপরে উঠে ?

—তবু কেন উঠলে ?

—ভেতরে ভেতরে নিজের সঙ্গে যে চ্যালেঞ্জ ছিল, সেটাকে অস্বীকার করতে পারিনি কিছুতেই।

—তবে, এখন কেন নেমে যেতে চাইছো ?

উত্তর না দিয়ে কুলদীপ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মেরির দিকে। হঠাৎ কুলদীপের চোখে জল এসে গেল। ধরা গলায় সে বললো, জীবনের সার্থকতা খোঁজা আরও কঠিন তা আমি জানি। কিন্তু এ খোঁজায় মানুষের বড় প্রেরণা কি

জানো ? ভালোবাসা ! আমাকে কে ভালোবাসবে বলো ? কেউ না !

মেরি তার মুখখানা নিচু করে এনে কুলদীপের গালে গাল ছোঁয়ালো।

পরদিন প্যারালাল বার প্র্যাকটিস করতে গিয়ে প্রথম মাটিতে দু'পা ঠেকিয়ে দাঁড়াতে পারলো কুলদীপ। সে জন্য তাকে দু' খানা ক্রাচ দেওয়া হয়েছে। কুলদীপের মনে হলো, কতকাল পরে সে দাঁড়িয়েছে দু' পায়ে, যেন এক জন্ম পরে।

কুলদীপের দুটো পা-ই অবশ্য এখনো সম্পূর্ণ অবশ। দুটি ক্রাচে ভর দিয়ে সে দাঁড়াতে পারলেও সামান্য এগোবার ক্ষমতাও তার নেই। সে প্রাণপণে চেষ্টা করলো, সামনের দিকে এক পা বাড়াতে, তার কপালের শিরা ফুলে গেছে, মুখ লাল হয়ে গেছে, তবু সে পা নাড়াতে পারছে না। ডাক্তার ওয়াল্‌শ ও দু' জন ইনস্ট্রাক্টর কুলদীপের পেছনে ও দু' পাশে সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যাতে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে না যায়।

এক সময় নিজের ব্যর্থতা বুঝতে পেরে সে মুখ ফিরিয়ে বললো, আমি আর পায়ের ব্যবহার করতে পারবো না কোনোদিন ? সামনে এগোতে পারবো না ?

ডাক্তার বললেন, কিচ্ছু বলা যায় না। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোক দু' পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে, কিন্তু মাত্র দু' চারজনই সামনে এগোয়, তাই না ? বিছানায় শুয়েও কেউ কেউ সামনে এগোতে পারে।

সেইদিনই কুলদীপ তীর ছোঁড়া প্রতিযোগিতায় তিরিশজন প্রতিযোগীকে হারিয়ে দিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলো। তাকে দেওয়া হলো একটা ট্রফি। এখন তাকে অনেকটা উৎফুল্ল দেখাচ্ছে।

সন্ধেবেলা ইন্ডিয়ান হাই কমিশন একটা ফিল্‌ম দেখবার ব্যবস্থা করেছে লণ্ডনে। সেখানে কুলদীপ আমন্ত্রিত। গাড়ি এসেছে তার জন্য। মেরি হুইল চেয়ারটা নিয়ে গেল হাসপাতালের গেটের সামনে দাঁড়ানো গাড়ির কাছে। তারপর মেরি যেই কুলদীপকে গাড়িতে তোলার জন্য হাত বাড়িয়েছে, কুলদীপ বললো, দাঁড়াও, আমি দেখি, নিজের চেষ্টায় উঠতে পারি কি না।

হাত দিয়ে দরজা খুলে, শুধু হাতের ওপর সমস্ত শরীরের ভর নিয়ে কুলদীপ অসম্ভব মানসিক জোরে এক লাফে গিয়ে পড়লো গাড়ির সিটে। মেরি হাততালি দিয়ে উঠলো। আত্মতৃপ্তিতে হেসে উঠলো কুলদীপ। কাশ্মীরে গুলি খেয়ে আছড়ে পড়ার পর কুলদীপ এমন ভাবে আর কখনো হাসেনি।

ইন্ডিয়ান হাই কমিশন দেখাচ্ছে এভারেস্ট অভিযানের তথ্যচিত্র। বেশ কিছু লণ্ডনের ভারতীয় এসেছে সেখানে। এসেছেন সস্ত্রীক লর্ড হান্ট। কুলদীপ

তাঁর পাশে বসে গল্প করছে।

ছবি চলতে চলতে রিল ছিড়ে গেল এক জায়গায়। সেটা ঠিক ঠাক করার জন্য হলে আলো জ্বলে উঠলো। দু' একজন দর্শক উঠে যেতে লাগলো বাইরে। তাদের মধ্যে একজনের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল কুলদীপ। গীতা।

গীতার পাশে একজন সুদর্শন যুবক। কুলদীপকে দেখে গীতা থমকে দাঁড়ালো। দু' এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সে এগিয়ে এলো কুলদীপের দিকে। কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছ, কুলদীপ।

কুলদীপ তখনো মুখ নিচু করে ছিল, এবার মুখ তুলে তাকালো। তার মুখ দেখলে মনে হয়, গীতাকে সে চিনতে পারেনি।

গীতা তার পাশের লোকটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, এ আমার বন্ধু, প্রেম ভাসিন, লণ্ডনে ব্যবসা করে।

কুলদীপ শুকনো গলায় বললো, হাউ ডু ইউ ডু!

যুবকটি বিগলিত ভাবে বললো, আপনার একটা অটোগ্রাফ পেতে পারি? তারপর সে প্যান্ট ও কোটের সব পকেটে খুঁজতে লাগলো এক টুকরো কাগজ।

হঠাৎ আবার আলো নিভে গেল। আবার পর্দায় ফুটে উঠলো ছবি। কিন্তু হিমালয়-অভিযানের বদলে কুলদীপ যেন পর্দায় দেখতে পাচ্ছে দিল্লির হাসপাতালে গীতার শেষ বিদায় নেবার দৃশ্য।

ভারত সরকার কুলদীপের চিকিৎসার জন্য ছ' মাসের টাকা স্যাংকশান করেছিল। প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে ছ' মাস। দিল্লি থেকে এক বন্ধু জানিয়েছে যে প্রয়োজন হলে চিকিৎসার মেয়াদ আরও বাড়াবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা যেতে পারে। তবে, তাতে সময় লাগবে।

এর মধ্যে কুলদীপের মা-ও খুব উতলা হয়ে পড়েছেন। তিনি নিজের গয়না বিক্রি করে টিকিট কেটে দেখতে আসতে চান ছেলেকে। কুলদীপ ঠিক করে ফেললো, সে ফিরে যাবে। সে এখনো যথেষ্ট সুস্থ বোধ করে। পা দুটো ছাড়া সে শরীরের আর সব প্রত্যঙ্গেই জোর ফিরে পেয়েছে। হাসপাতালের চিকিৎসকদের মত এই যে, কুলদীপ এখানে যা ট্রেনিং পেয়েছে, ভারতে ফিরে গিয়েও সেই ব্যায়ামগুলো করে গেলে তার আর কোনো অসুবিধে হবে না।

ফেরার দিন নির্দিষ্ট হয়ে গেল। হাসপাতালের সকলের কাছ থেকে বিদায় নেওয়াও হলো একে একে। নিজের ঘরের নিভৃতে সে মেরিকে বললো, আমি

চলে যাচ্ছি। তোমাকে একটা অনুরোধ করবো ? তুমি আমার সঙ্গে যাবে ইন্ডিয়া ?

মেরি একটু চমকে গিয়ে বললো, তা কি করে সম্ভব, দীপ ! আমি এখানকার কাজ ফেলে তোমার সঙ্গে যাবো কি করে ?

কুলদীপ বললো, কাজ ছেড়ে দিয়ে যেতে পারো না ? তুমি একদিন বলেছিলে, তোমার বাবা ইন্ডিয়াতে থাকতেন, তোমার বাবা-মায়ের ইন্ডিয়াতেই বিয়ে হয়েছিল। তোমার খুব ইন্ডিয়াতে যেতে ইচ্ছে করে।

মেরি বললো, হ্যাঁ, একদিন যাবো নিশ্চয়ই ; বেড়াতে যাবো। তখন তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে।

কুলদীপ বললো, কেন, এখন যেতে পারবে না কেন ? আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না ! তোমাকে ছাড়া....আমি কল্পনাই করতে পারছি না।

মেরি শুকনো গলায় বললো, এরকম অযৌক্তিক অনুরোধ কোরো না, কুলদীপ। আমি তোমাকে চিঠি লিখবো।

মুখ নিচু করে নিজের হাতের আঙ্গুলগুলো দেখতে লাগলো কুলদীপ।

তারপর আপন মনে বললো, অযৌক্তিক ! হ্যাঁ, আমি বোধহয় ছেলেমানুষের মতন আবদার করছি। তুমি ইণ্ডিয়াতে গিয়ে কি করবে ? সেখানে তো এত ভালো হাসপাতাল নেই।

মেরি জোর করে খানিকটা উৎফুল্ল হবার চেষ্টা করে বললো, আজ তোমার সম্মানে আমি একটা শ্যাম্পেনের বোতল খুলতে চাই। আমরা দু' জনে নিরিবিলিতে বসে শ্যাম্পেন পান করবো।

কুলদীপ বললো, তুমি একটু আমার কাছে এসো।

মেরি ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে কুলদীপের মুখে আদরের হাত বুলোতে লাগলো।

কুলদীপ সেই হাতটা চেপে ধরে বললো, ভালো নার্স হতে গেলে খুব ভালো অভিনেত্রীও হতে হয়, তাই না ?

মেরি থতমত খেয়ে গেল। কি বলবে বুঝতে পারলো না।

কুলদীপ আবার বললো, আমি তোমাকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নার্স এবং সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে শ্রদ্ধা করি।

॥ ৯ ॥

দিল্লি ফিরে আসার পর কুলদীপকে আবার চেক আপ করার জন্য কিছুদিন রাখা হলো হাসপাতালে। ইংল্যাণ্ডে চিকিৎসায় তার বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে। দিল্লির ডাক্তাররা আশাই করেননি যে কুলদীপ এতগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ফিরে পাবে। চেয়ারে বসে থাকলে তাকে একেবারে স্বাভাবিক মানুষের মতন মনে হয়। হুইল চেয়ারে সে নিজে নিজে চলাফেরাও করতে পারে। শুধু সে দু' পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারে না। কোমরের নীচ থেকে সম্পূর্ণ অবশ। তার যৌন ক্ষমতা নেই। অথচ তার রূপতৃষ্ণা আছে। নারী সঙ্গের জন্য আকুতি আছে। ভালোবাসার জন্য ব্যাকুলতা আছে। তার মস্তিষ্কের বিচারে সে সম্পূর্ণ পুরুষ, অথচ তার পুরুষত্ব নেই।

এই কথাটা যখনই মনে পড়ে, তখনই কুলদীপের ঘৃণা হয় নিজের ওপরে। জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা আসে। অন্য লোকদের প্রতি ব্যবহার রুক্ষ হয়ে যায়। মেয়েদের সহ্য করতে পারে না।

কুলদীপের সহকর্মী এবং বন্ধুরা দেখা করতে আসে। নানা রকম হাসি-ঠাট্টা করে। দু' একটা যৌন-রসিকতাও এসে পড়ে। তারা দেখাতে চায়, তাদের সঙ্গে কুলদীপের এখন আর কোনো তফাত নেই।

এদের মধ্যে সারিনকে একদিন আলাদা ডেকে কুলদীপ সরাসরি জিজ্ঞেস করলো যে, এরপর তার ভবিষ্যৎ কী? সে হুইল চেয়ারে বসে বাকি জীবনটা কাটাবে, আর সরকার তার সব খরচ দেবে? কিংবা, এবার তার চাকরি যাবে?

সারিন বললো, না, না, চাকরি যাবে কেন? তুমি ন্যাশনাল হিরো। সরকার তোমার সমস্ত দায়িত্ব নেবে!

কুলদীপ বললো, অনেক বিখ্যাত স্পোর্টসম্যান শেষ জীবনে খেতে পায় না। এরকম ঘটনা বহু শুনেছি। তা ছাড়া আমি কোনো কাজ না করে শুধু শুধু সরকারের কাছ থেকে টাকা নেবো কেন? আমার আত্মসম্মান নেই?

সারিন বললো, তোমাকে কাজ দেবার কথাও চিন্তা করা হচ্ছে। তুমি ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টে অফিস ওয়ার্ক করতে পারো। আর্মস প্রোডাকশান সুপারভাইজ করতে পারো। কিন্তু কাজের জন্য তুমি এখনি ব্যস্ত হচ্ছো কেন? আরও কিছুদিন বিশ্রাম নাও।

কুলদীপ জিজ্ঞেস করলো, রবি কোথায়? তার সঙ্গে আর আমার একবারও যোগাযোগ হয়নি। সেই রাস্কেলটা কি আমাকে ভুলে গেল?

সারিন একটু ইতস্তত করে বললো, রবির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সে আর কাজ করতে চায় না। সে দেশের বাড়িতে থাকে।

কুলদীপ জিজ্ঞেস করলো, সে এর মধ্যে বিয়ে করে ফেলেছে নাকি? যদি আমাকে না জানিয়ে বিয়ে করে।

এর উত্তরটা আর শোনা হলো না। সারিন কি একটা ছুতো করে উঠে গেল!

অরডনান্স ফ্যাক্টরির অফিসে একটা কাজ ঠিক হয়ে গেল কুলদীপের। জয়েনিং ডেট এক মাস পরে। মাঝখানের সময়টা কুলদীপ তার গ্রামের বাড়িতে কাটিয়ে আসতে চায়। কুলদীপের বাবা-মায়েরও খুব ইচ্ছে।

অনেক দিন পর গ্রামে ফিরলো কুলদীপ। এখানে তার শৈশব স্মৃতি আছে। বহুকালের ভৃত্য শের সিং এখনো রয়ে গেছে। এই শের সিং কুলদীপকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিল। সেই শের সিং হুইল চেয়ারে বসে কুলদীপকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে কান্না সামলাতে পারলো না।

কুলদীপই সান্ত্বনা দিল তাকে।

কুলদীপ এসেছে শুনে কাছাকাছি কয়েকটা গ্রামের মানুষ ভিড় করে দেখতে এলো। এদিককার গ্রামে অনেক জোয়ান ছেলেই সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। কেউ কেউ আহত হয়ে ফিরে আসে। কিন্তু কুলদীপের কথা আলাদা। সে এভারেস্ট-জয়ী, বহু কাগজে তার ছবি ছাপা হয়েছে; রেডিওতে তার নাম শোনা যায়।

সব সময় মানুষের ভিড়। কিন্তু একজন আসে না। সে রবি। রবির গ্রাম এখান থেকে পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে। কুলদীপ তার ভাই সুরিকে বলেছে রবিকে খবর দিতে। সুরি জানায় যে খবর দেওয়া হয়েছে, সে আসবে। তবু রবি আসে না। কুলদীপের দিল্লি ফেরার দিন এসে যাচ্ছে।

একদিন কুলদীপ জেদ ধরে বললো, সে নিজেই যাবে রবির বাড়িতে। মা-বাবা বাধা দেবার চেষ্টা করলেন নানান ছুতোয়, কিন্তু কুলদীপ কিছুতেই শুনবে না। তার সন্দেহ হতে লাগলো, রবি কি তা হলে বেঁচে নেই? সবাই গোপন করে যাচ্ছে? কিন্তু সে কথা জিজ্ঞেস করলেই সবাই এক বাক্যে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, রবি বেঁচে আছে।

একটা গাড়ি জোগাড় করা হলো। সুরিকে নিয়ে একদিন সকালে বেরিয়ে পড়লো কুলদীপ। সুরি কি রকম যেন অস্বস্তিতে ভুগছে। কুলদীপের দিকে তাকাচ্ছে না ভালো করে। এক সময় কুলদীপ তার হাত চেপে ধরে বললো, কি

হয়েছে। সত্যি করে বল তো আমাকে ? রবি আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, তার সম্পর্কে তোরা কি গোপন করছিস ?

গমের খেতের পাশে গাড়িটা থামালো সুরি। কম্পিত গলায় বললো, বড়েভাইয়া, আমার মনে হয়, এখনো তোমার ফিরে যাওয়া উচিত। রবির কাছে তোমার না যাওয়াই ভালো। সে তোমাকে চিনতে পারবে না।

কুলদীপ স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে বললো, চিনতে পারবে না মানে ! রবি কি পাগল হয়ে গেছে ?

সুরি বললো, তার চেয়েও খারাপ অবস্থা ! ডাক্তাররা প্রথম দিকে তোমাকে জানাতে নিষেধ করেছিল। তারপর আমরা তোমাকে ঠিক কখন, কী ভাবে বলবো তা বুঝতে পারিনি। তুমি বাড়ি ফিরে চলো, সব বলবো এবার।

কুলদীপ তবু জোর করে এলো রবির বাড়িতে। রবির মা কান্না লুকোবার জন্য মুখ ঢাকলেন, রবির বাবা গম্ভীর মুখে বললেন, তুমি অনেক সুস্থ হয়ে উঠেছো, কুলদীপ, দেখে খুব খুশী হলাম।

রবির ঘরটা আধো-অন্ধকার। জানলাগুলো বন্ধ। বড় একটা খাটে অনেকগুলো বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে রবি। পা দুটো সামনে ছড়ানো। রবির মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথা ভর্তি জট পাকানো চুল।

দরজার কাছে এসে কুলদীপ কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো রবির দিকে। রবি তাকে গ্রাহ্য করলো না। শিয়রের কাছে হুইল চেয়ারটা নিয়ে গিয়ে কুলদীপ নরম গলায় ডাকলো, রবি, রবি !

রবি তাতেও সাড়া দিল না।

কুলদীপ এবার রবির একটা হাত ধরতে গেলে রবির বাবা বলে উঠলেন, ধরো না, ধরো না ! ততক্ষণে কুলদীপ ধরে ফেলেছে।

রবি প্রবল জোরে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে অদ্ভুত দুর্বোধ্য একটা চিৎকার করে উঠলো। দারুণ ভাবে মাথা নাড়তে লাগলো। কুলদীপ চমকে পিছিয়ে গেল খানিকটা।

রবির বাবা শুকনো গলায় বললেন, ওর কোনো বোধ নেই। মানুষ চিনতে পারে না একেবারেই। কথা বলার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে।

রবি তখনো চিৎকার করে যাচ্ছে। ফ্যানা বেরুচ্ছে তার মুখ দিয়ে।

রবি সমস্ত চিকিৎসার অতীত হয়ে গেছে। ডাক্তাররা বলেছেন, তার আর কোনো আশা নেই। শিরদাঁড়ার আঘাতে বিকল হয়ে গেছে তার অধিকাংশ স্নায়ু। হৃৎপিণ্ডটা কাজ করছে বলে সে বেঁচে আছে, কিন্তু তার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ

বোধহীন। রবির বাবা যথাসাধ্য চিকিৎসার চেষ্টা করে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন। এখন এই অবস্থাটা মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।

কুলদীপ দারুণ বিচলিত হয়ে জানতে চাইলো, রবিকেও তার মতন ইংল্যান্ডের স্টোক ম্যান্ডেভিল হাসপাতালে পাঠানো হলো না কেন? সেখানকার চিকিৎসায় উপকার হতে পারতো।

রবির বাবা শান্ত ভাবে বললেন, বিলেতে চিকিৎসা করাবার সাধ্য তো আমার নেই! তুমি এভারেস্টজয়ী জাতীয় বীর, তোমার ভার নিয়েছেন ভারত-সরকার। কিন্তু রবি তো শেষ পর্যন্ত চূড়ায় উঠতে পারেনি। তাই সরকার তার জন্য বিশেষ সুবিধে দেবে কেন? সে একজন আর্মি অফিসার মাত্র! সবাইকে কি আর সরকার বিদেশে পাঠায়!

কুলদীপের মনে পড়লো, রবি হাসতে হাসতে প্রায়ই বলতো, আই অ্যাম আ বর্ন লুজার!

আধো-অন্ধকার ঘরে বিছানার এক কোণে বসে বিকৃত শব্দ করছে রবি, মনে হচ্ছে সে যেন মানুষ নয়, কোনো প্রাগৈতিহাসিক জন্তু!

লজ্জা-গ্লানি-ক্রোধ-অসহায়তা সব কিছু ফুটে উঠেছে কুলদীপের মুখে। সে যেন মহা স্বার্থপর! কেন রবির এই অবস্থার কথা তাকে আগে জানানো হয়নি?

কোনোক্রমে সে বললো, ঘরটা এত অন্ধকার কেন? একটা জানলা খুলে দিন, আমি রবিকে ভালো করে দেখি। ও কি সত্যিই আমাকে চিনতে পারবে না?

রবির বাবা বললেন, ও আলো সহ্য করতে পারে না একেবারেই। আলোতে কি রকম করে, দেখবে?

তিনি একটা জানলা খুলে দিতেই রবি সাঙ্ঘাতিক দাপাদাপি শুরু করে দিল। যেন তার চোখ অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পা দুটো আছড়াতে লাগলো বিছানার ওপর। মুখের থেকে জিভটা বেরিয়ে এলো অনেকখানি।

রবির মুখের দিকে তাকাতে পারছে না কুলদীপ। সে রবির পা দুটো দেখছে। মনে হয় যেন, সুস্থ, সবল দুটি পা। কুলদীপ দু' হাতে মুখ চাপা দিল।

সঙ্গে সঙ্গে যেন আরও প্রচুর আলোয় ভরে গেল ঘর। ঘরখানা হয়ে গেল তুষারময় প্রান্তর। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, প্রাণবন্ত রবি ঢালু পাহাড় দিয়ে ছুটে এসে কুলদীপের হাত ধরে বলছে, ঠিক মতন পা ফেলতে শেখ, পড়ে যাস না!

বাড়ি ফিরে এসে কুলদীপ গুম হয়ে রইলো সারা দিন।

পরদিন সে ফেটে পড়লো। বাবা-মাকে ডেকে বললো, যেমন করে হোক, রবির চিকিৎসা করাতেই হবে। কুলদীপের নিজের যা কিছু আছে, তা সে খরচ করবে রবির জন্য।

সুরি তাকে অনেক করে বোঝালো যে, এখন আর চিকিৎসায় কোনো লাভ নেই। দু' তিনজন স্পেশালিস্ট রবিকে এসে দেখে সেই কথাই বলে গেছেন। একেবারে গোড়ার দিকে ওকে বিলেতে পাঠালে হয়তো সুফল পাওয়া যেতে পারতো, কিন্তু এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

কুলদীপ তবু দিল্লির ডাক্তারদের মতামত জানতে চায়। মাস শেষ হবার আগেই সে গ্রাম ছেড়ে চলে এলো দিল্লিতে।

দিল্লিতে কোনো ডাক্তার তাকে ভরসা দিতে পারলো না। দু' জন ডাক্তার তাকে জানালো যে রবি দত্ত ইজ আ লস্ট কেস। ভেরি আনফরচুনেট। পিঠ থেকে বুলেট বার করতে গিয়ে ওর নার্ভাস সিসটেম আরও বেশি ড্যামেজ্‌ড হয়ে গেছে।

কুলদীপের বারবার মনে পড়ে, যুদ্ধের শেষ দিনটার কথা। যুদ্ধ থেমে গেছে তখন, রবি ছিল নিরাপদ জায়গায়। বন্ধুকে খুঁজবার জন্যই বেরিয়ে পড়েছিল রবি। অকারণে তারা দু' জনে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। কুলদীপের খোঁজে যদি না আসতো, তা হলে রবির কিছুই হতো না।

রবি তার মতন চিকিৎসার সুযোগ পেল না। এভারেস্টের চূড়ার মাত্র দেড় হাজার ফিট নীচে থেকে ফিরে এসেছিল রবি, তবু তার কৃতিত্ব কি কিছু কম!

মনের ভার কাটাবার জন্য চাকরিতে যোগ দিল কুলদীপ।

প্রতিরক্ষা দফতরের অফিস। বুরোক্র্যাট, টেকনিশিয়ান ও কেরানিদের আধিপত্য, অধিকাংশই ফাইল চালাচালির কাজ, এখানে একজন আর্মি অফিসারের বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই। কুলদীপকে তার সামরিক পরিচয়টা মুছে ফেলে বুরোক্র্যাট হতে হবে।

প্রথম দিনে ক্যান্টিনের হলে একটা ছোটখাটো সম্বর্ধনা দেওয়া হলো কুলদীপকে। অরড্‌ন্যান্স ফ্যাকট্রিজ-এর ডি জি মজুমদার সাহেব এসেছেন, এসেছেন ডিফেন্সের জয়েন্ট সেক্রেটারি, তাঁরা এবং ইউনিয়ানের দু' জন নেতা বক্তৃতা দিলেন ; এভারেস্টজয়ী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কুলদীপ সিং এই অফিসে যোগ দিচ্ছেন বলে তাঁরা গর্বিত।

এই সব উচ্ছ্বাস কুলদীপকে আর স্পর্শ করে না।

একটা মঞ্চের ওপর মজুমদার সাহেবের পাশে তাঁকে বসানো হয়েছে। দুটি

ইউনিয়ানের পক্ষ থেকে দু'খানা ফুলের মালা তার গলায়। এক সময় মজুমদার সাহেবকে সে ফিস ফিস করে বললো, আর কোনো নতুন অফিসার জয়েন করলে কি এরকম ভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয় ?

মজুমদার হেসে বললেন, এটা স্পেশাল অকেশান। আপনি যে একজন ভেরি স্পেশাল পার্সন।

কুলদীপ বললো, আমি কিন্তু অফিসে কোনো অতিরিক্ত খাতির চাই না। এখানকার ম্যানেজমেন্টকে সেটা বলে দেবেন। আমার কাজে কোনো ভুল ভ্রান্তি হলেও যেন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

কুলদীপের একটা নিজস্ব চেম্বার দেওয়া হলো দোতলায়। একতলায় হলে তার সুবিধে হতো, কিন্তু নীচের তলায় সেরকম কোনো সুবিধে নেই। এমনিতে চলা ফেরায় কুলদীপের তেমন কোনো অসুবিধে নেই, শুধু সিঁড়ি দিয়ে সে উঠতে পারে না।

হাউজ খাস এলাকায় দু' কামরার একটা ফ্ল্যাট পেয়েছে কুলদীপ। সেটা গ্রাউন্ড ফ্লোরে, বেশ ছিমছাম ব্যবস্থা। প্রথম কিছুদিন মা এখানে থেকে সংসার গুছিয়ে দিলেন। বাবার শরীর ভালো নয় বলে কুলদীপই তাঁকে জোর করে পাঠিয়ে দিল গ্রামের বাড়িতে। পুরনো পরিচারক শের সিং রয়ে গেল তার কাছে, সে কুলদীপকে সন্তানের মতন ভালোবাসে। শের সিং-এর তিয়াত্তর বছর বয়েস, চুল-দাড়ি সব ধপধপে সাদা, কিন্তু শরীর একটুও দুর্বল নয়। তার নিজস্ব কোনো সংসার নেই। কুলদীপদের বাড়িতেই আছে বহুকাল।

সকালবেলা শের সিং কুলদীপকে তৈরি করে দেয়। অফিসের একটা গাড়ি তাকে নিতে আসে। শের সিং কুলদীপকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে পৌঁছে দেয় গাড়ি পর্যন্ত। চেয়ারটা গুটিয়ে রাখা হয় গাড়ির পেছনে। অফিসে পৌঁছে গাড়ির ড্রাইভার চেয়ারটা নামিয়ে ফিট করে দেয়। অন্যের সাহায্য লাগে না, কুলদীপ নিজেই গাড়ি থেকে চেয়ারে বসতে পারে। শরীরটা বাঁকিয়ে, দু' হাতে ভর দিয়ে বসা অবস্থায় তাকে একটা ছোটখাটো লাফ দিতে হয়, সেই প্রক্রিয়াটা দেখলে কাছাকাছি অন্য যে-কেউ হাত বাড়িয়ে তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করবে স্বাভাবিক ভাবেই, কিন্তু কুলদীপ প্রথম দিন থেকেই অন্যদের সাহায্য নিতে অস্বীকার করেছে।

লিফটের কাছে পৌঁছোনোর আগে তাকে তিন ধাপ সিঁড়ি উঠতে হয়। গাড়ির ড্রাইভারই এই সময় তার চেয়ারটা তুলে দেয়। তারপর আর কোনো অসুবিধে নেই। দোতলায় লিফ্‌ট থেকে নেমে কুলদীপ চলে যায় নিজের

ঘরে।

একদিন কুলদীপ অফিসে এসে দেখলো, লিফ্‌টটা খারাপ হয়ে আছে। সরকারি অফিসের ব্যাপার, সঙ্গে সঙ্গে সারাবার তো ব্যবস্থা নেই, গোটা দিন লেগে যাবে, কিংবা পরের দিনেও সারানো না হতে পারে।

এইখানে কুলদীপ অসহায়। অতগুলো সিঁড়ি বেয়ে সে ওপরে যাবে কি করে?

অন্য কর্মচারীরা আসছে, কুলদীপের দিকে তাকিয়ে লিফ্‌ট বন্ধ দেখে তারা তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে। দু' একজন অফিসার এসে বললো, লিফ্‌ট বন্ধ, মিঃ সিং। আপনি আজ বাড়ি চলে যান।।

যেন অফিস না করে বাড়ি ফিরে যাওয়াটা আনন্দের ব্যাপার।

একজন চ্যাংড়া গোছের কেরানি খানিকটা দূরে অন্য একজনকে বললো, আমাকে উঠতে হবে পাঁচ তলায়। সারা দিনে চার-পাঁচবার ওঠা-নামা করতে হয়। লিফ্‌ট বন্ধ থাকলে আমারও ছুটি পাওয়া উচিত!

অপমানে মুখখানা রক্তাভ হয়ে গেল কুলদীপের। সেই কেরানিটির ওপরে তার রাগ হয় না। কিছু লোক এই ধরনের কথা বলবেই। সে অতিরিক্ত সুযোগ নিতে যাবে কেন?

সেদিন ফিরে যেতে বাধ্য হলো কুলদীপ, কিন্তু পরদিন থেকে শের সিং তার সঙ্গে সঙ্গে অফিস পর্যন্ত আসে। আবার একদিন লিফ্‌ট বন্ধ দেখে বৃদ্ধ শের সিং চেয়ার সমেত কুলদীপকে দোতলায় তুলে দিল সিঁড়ি দিয়ে। অনেকে ভিড় করে দেখলো বটে দৃশ্যটা, কিন্তু কুলদীপের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

যতই মন দিয়ে কাজ করতে চাক কুলদীপ, তবু এই অফিসের কাজের ধরনধারনের সঙ্গে সে নিজেকে মেলাতে পারে না। আর্মির থেকে সিভিলিয়ানদের অনেক তফাত। এখানে সব কিছুই কেমন যেন ঢিলে-ঢালা। আর্মিতে যাকে যে-কাজের নির্দেশ দেওয়া হবে, সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা পালন করবেই। এখানে সে-রকম কোনো ব্যাপার নেই। একজন অধস্তন কর্মচারীকে যদি বলা হয়, এই ফাইলটা কালকের মধ্যে অবশ্যই আপ-টু ডেট করে আনবেন, সে বলে, ইয়েস স্যার, অফ কোর্স স্যার। তারপর দু' দিন সে বেমালুম অফিস ডুব দেয়। আর্মিতে এ রকম লোককে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দেওয়া হতো, এখানে ক্যাজুয়াল লিভের দরখাস্ত করলেই সাত খুন মাফ।

কুলদীপ অনুভব করে, সে অন্যদের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে মিশতে পারে না। অন্যদের দেরি করে অফিসে আসা, কাজের সময় করিডোরে দাঁড়িয়ে গল্প

করা, টিফিনে যাবার নামে তিন ঘন্টা পরে আসা, এসব দেখলে তার রাগ হয়। কিন্তু সে জানে, সে একা এসব সংশোধন করতে পারবে না। রাগারাগি করলেও উল্টো ফল হবে। সে শুধু দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারছে না। সে প্রত্যেকদিন এত বেশি কাজ করে যে অন্য অফিসাররা ব্যাতিব্যস্ত হয়ে যায়।

অনেকেই তাকে সমীহ করে দূরে দূরে থাকে। সাধারণ কর্মচারীরা নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথাই বলে না তার সঙ্গে। শুধু মিঃ দুবে আর মিঃ শ্রীনিবাসন নামে দু' জন অফিসার মাঝে মাঝে গল্প করতে আসে তার চেম্বারে। শ্রীনিবাসন খুবই কাজের লোক, তার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পায় কুলদীপ, কিন্তু শ্রীনিবাসন বড্ড বেশি সিগারেট খায়, সিগারেটের ধোঁয়া কুলদীপ সহ্য করতে পারে না। তার শ্বাসকষ্টটা একেবারে যায় নি এখনো, কিন্তু সে কথা কারুকে বলে না। দুবে বেশ প্রাণ খোলা হাসি খুশি মানুষ, আড্ডা দিতে ভালোবাসে, কবিতা আওড়ায়। সে বলে, মিঃ সিং, আপনি এত ফাইল পাঠাবেন না! এত কাজের ধাক্কায় যে পাগল হয়ে যাবো!

কুলদীপও হাসতে হাসতে বলে, আর্মি ট্রেইনিং নিলে এই রকম পাগলই হতে হয়।

একদিন সারিন এলো অফিস ছুটির পর তার সঙ্গে দেখা করতে। কুলদীপকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল একটা ক্লাবে। খানিকটা মদ্যপান করে বললো, তুমি কাশ্মীরে আহত হয়ে যখন দিল্লি পৌঁছলে তখন তোমাকে দেখে কল্পনাই করতে পারিনি, কুলদীপ, তুমি কোনো দিন স্বাভাবিক মানুষের মতন আবার কাজকর্ম করতে পারবে। অসম্ভব তোমার মনের জোর। অফিসে তোমার কাজের খুব প্রশংসা শুনেছি।

কুলদীপ বললো, তোমরা যদি যুদ্ধটা না বাধাতে, তা হলে নিজের পায়ের জোরটাও আমি হারাতাম না। আমি আবার পাহাড়ে উঠতাম।

সারিন বললো, যুদ্ধ বাধাবার দায়টা তুমি আমার কাঁধে চাপাতে চাও? গত বছরের যুদ্ধটা পাকিস্তানীরা আমাদের ওপর ইনফ্লিক্ট করেছে।

কুলদীপ বললো, তুমি পাকিস্তানে যাও, ঠিক এর উল্টো কথা শুনবে। সেখানে সবাই জানে, ইন্ডিয়াই যুদ্ধ বাধিয়েছে। এই ইউসলেস যুদ্ধে দু' দেশের কেউ কিছু গেইন করেনি, শুধু শুধু কতগুলো মানুষ... দ্যাখো, এই যুদ্ধের জন্য আমার বন্ধু রবি, অমন একটা ব্রিলিয়ান্ট পার্সন...

সারিন হাত তুলে বাধা দিয়ে বললো, ঐ প্রসঙ্গ থাক। তুমি এখন সিভিলিয়ান হয়েছো, তাই এসব কথা বলতে পারছো। আর্মিতে থাকলে কি

পারতে ? শোনো কুলদীপ, আমি একটা অন্য কথা বলছি। তুমি শুধু অফিসে কাজ করছো, আর বাড়িতে একা একা সময় কাটাচ্ছো, এটা ঠিক স্বাস্থ্যকর নয়।

—একা থাকতে আমার ভালোই লাগে। হাসপাতালে থেকে থেকে অভ্যেস হয়ে গেছে।

—এখন তুমি হাসপাতালে নেই। তোমার মাঝে মাঝে সোসিয়ালাইজ করা দরকার। দিল্লিতে তোমার এভারেস্ট টিমের বন্ধু আছে কয়েকজন। তাদের বাড়ি গিয়ে আড্ডা দিতে পারো, তোমার ওখানে তাদের ডাকতে পারো। তুমি অরড্‌ন্যান্স ক্লাবের মেম্বার হয়ে যাও। অবশ্য তোমার ফ্রি মুভমেন্টের জন্য একটা নিজস্ব গাড়ি দরকার। তুমি তো আগে ড্রাইভ করতে ?

—তুমি ভুলে যাচ্ছো, সারিন, মোটর কার এখনো একটা ক্রুড যন্ত্র। সেটা চালাতে গেলে দুটো পা আর দুটো হাত ব্যবহার করতে হয়। এর মধ্যে আদ্ধেক আমার নেই।

—স্পেশাল ডিজাইনের গাড়িও পাওয়া যেতে পারে। ক্লাচ ব্রেক অ্যাকসিলারেটর এসব হাত দিয়ে কন্ট্রোল করা যায়। আমি সেরকম একটা সেকেন্ড হ্যান্ড ভিভা ভকসল গাড়ি দেখেছি। আগে একজন হ্যান্ডিক্যাপ্‌ড ভদ্রলোকের ছিল। সেটা... সরি, কুলদীপ। হ্যান্ডিক্যাপ্‌ড শব্দটা শুনে তুমি রেগে গেলে না তো ?

—না, ঐ শব্দটা শুনে রাগ করবো কেন ? কিন্তু ঐ শব্দটা উচ্চারণ করার সময় যদি করুণা, দয়া কিংবা অবজ্ঞার ভাব থাকে, সেটাই সহ্য করা যায় না। আমি হ্যান্ডিক্যাপ্‌ড তো বটেই। কিন্তু যে-সব মানুষের খানিকটা বুদ্ধি কম থাকে, তারাও তো—হ্যান্ডিক্যাপ্‌ড, তাই না ? তাদের কি আমরা মুখের ওপর বোকা বলি ?

—দুঃখের বিষয় পৃথিবীতে বোকাদের সংখ্যাই বেশি। সেই মেজরিটির বিরুদ্ধে মুখ খোলা যায় না। যাই হোক, গাড়িটা দেখবে ?

—নিশ্চয়ই অনেক দাম ? আগে আমাকে টাকা জমাতে হবে। আমার চিকিৎসার জন্য সরকার অনেক দিয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের পরিবারেও যথেষ্ট খরচ হয়েছে। সেই ধাক্কা আগে সামলে উঠি !

সারিন জোরাজুরি করলেও অন্য কোথাও যেতে তেমন আগ্রহ হয় না কুলদীপের। বাড়িতে থাকতেই ভালো লাগে। এ পি চৌহান নামে কলেজ জীবনের চেনা একজন একদিন প্রায় জোর করেই একটা ফাইভ স্টার হোটেলের পার্টিতে নিয়ে গেল। সেখানে পুরনো বন্ধু আরও কয়েকজন ও

তাদের স্ত্রীরা ছিল। কিন্তু কুলদীপ সর্বক্ষণ অস্বস্তি বোধ করেছে। অন্যরা ইচ্ছে মতন ঘোরাঘুরি করছে, এক টেবিল থেকে উঠে যাচ্ছে অন্য টেবিলে, মেয়েদের কোমর ধরে নাচছে, অথচ কুলদীপকে বসে থাকতে হচ্ছে এক জায়গায়। অন্যদের দৃষ্টিতেই বোঝা যায়, সে আলাদা, সে আলাদা! বিশেষত মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে খুবই বিব্রত বোধ করে কুলদীপ।

বাড়িতে বসে সে নিরিবিলিতে লেখা পড়া করে। জানলার ধারে তার টেবিল। হঠাৎই একদিন টাইপ রাইটারে কাগজ গুঁজে সে তার এভারেস্ট অভিযানের অভিজ্ঞতার কথা লিখতে শুরু করেছে। চিঠি লেখারও তেমন অভ্যেস তার ছিল না আগে, মনের কথাটা কি ভাবে প্রকাশ করতে হবে তার ভাষা ঠিক খুঁজে পায় না। দু' চার লাইন করে লিখেই থেমে যায়, জানলা দিয়ে দেখে পথের দৃশ্য।

॥১০॥

এই রাস্তাটা নিরিবিলি, গাড়ি-ঘোড়া কম। মাঝে মাঝে একটা মোটর সাইকেল হাওয়া কাঁপিয়ে ছুটে যায়। এক সুদর্শন যুবক বীর দর্পে সেটা চালায়। মিনিট দশেক বাদেই সেটা এই রাস্তা দিয়ে ফেরে, তখন পেছনে বসে থাকে একটি যুবতী। প্রতিদিন সন্ধেবেলা একটা নির্দিষ্ট সময়ে মোটর সাইকেলটা যায়। সেটার আওয়াজ শুনলেই কুলদীপ জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে। যৌবনবন্ত ঐ দুই তরুণ-তরুণীকে দেখতে তার ভালো লাগে।

এক ছুটির দিনের বিকেলে কুলদীপ বেরুচ্ছে সারিনের সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্য। ট্যাক্সিটা সবে সে স্টার্ট দিয়েছে, এমন সময় মোটর সাইকেলটা সশব্দে তার পাশ দিয়ে এসে ট্যাক্সিটার সামনে এসে দাঁড়ালো। খানিকটা বিরক্ত ভাবে ব্রেক কষলো ড্রাইভার। আর একটু হলেই অ্যাকসিডেন্ট হতে পারতো।

মোটর সাইকেলের পেছন থেকে তড়াক করে নেমে এলো তরুণীটি। ট্যাক্সির কাছে এসে বললো, আপনি নিশ্চয়ই মেজর কুলদীপ সিং? আমাকে একটা অটোগ্রাফ দেবেন?

কুলদীপ এবার সামান্য হেসে বললো, অটোগ্রাফ দেবার মতন কি যোগ্যতা আছে আমার?

তরুণীটি বললো, আমি মাউন্টেনিয়ারিং-এর ট্রেনিং নিয়েছি। আপনার কথা সব জানি। আমার বাড়ি খুব কাছেই। আপনার কাছে মাঝে মাঝে পাহাড়ের

গল্প শুনবার জন্য আসতে পারি ?

কুলদীপ বললো, হ্যাঁ এসো।

বন্ধুটির সঙ্গে পরিচয় করালো না মেয়েটি। অটোগ্রাফ নিয়ে আবার মোটর সাইকেলে উঠে চলে গেল। মেজাজটা হঠাৎ ফুরফুরে হয়ে গেল কুলদীপের। সুন্দরী নারীর সান্নিধ্য সে এড়িয়ে চলে। কিন্তু এই মেয়েটির যেন এক তীব্র জীবনী শক্তি আছে, সেটা তাকে স্পর্শ করে গেল, তাকে কিছুক্ষণের জন্য উন্মনা করে দিল।

লোকজনের মাঝখানে কুলদীপ মাঝে মাঝে খুব অসুহিষ্ণু হয়ে পড়ে। কেউ না কেউ তার গায়ে পড়ে সহানুভূতি দেখাতে চাইবেই। তখনই তার শরীরে একটা জ্বালা ধরে যায়। বিশেষত কোনো মেয়ে তার প্রশংসা করলেই তার মনে পড়ে, সে একজন অসম্পূর্ণ মানুষ। কেউ কেউ যখন আলোচনা শুরু করে যে কুলদীপ কত ভালো ভাবে সেরে উঠেছে, সে অন্য যে-কোনো মানুষের মতনই স্বাবলম্বী, তখন কুলদীপ হঠাৎ রূঢ় ভাবে বলে ওঠে, উইল ইউ প্লিজ চেইঞ্জ দা সাবজেক্ট ?

একা থাকাটাই অভ্যেস হয়ে গেছে কুলদীপের। ছবি আঁকার ইচ্ছেটা আবার তার ফিরে এসেছে। আগে সে ফুলের ছবিই আঁকতো, এখন একটা ফুলের ছবি আঁকতে আঁকতে সেটা হয়ে যায় কোনো নারীর মুখ, তারপর কুলদীপ সেই নারীর একটা শরীর দেয়। ছবিটা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে সেদিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর ঘ্যাস ঘ্যাস করে কাটাকুটি করে ছবিটার ওপর। টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দেয় ঘরময়।

একদিন সকালে শের সিং এসে বললো, দুটি মেয়ে দেখা করতে এসেছে তার সঙ্গে।

দুটি মেয়ের একজনকে চিনতে পারলো কুলদীপ। এই সেই মোটর সাইকেল আরোহিণী, যে তার অটোগ্রাফ নিয়েছিল সঙ্গে তার এক বান্ধবী। প্রথম মেয়েটির নাম নীনা, দ্বিতীয় মেয়েটির নাম অমৃতা। নীনা মেয়েটি উচ্ছল ধরনের, দ্বিতীয় মেয়েটি শান্ত। নীনার কথাবার্তা, হাসি, চলাফেরা, এই সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে যেন এক ঝলক টাটকা বাতাস। নীনাকে দেখেই কুলদীপের মনে হলো, এই মেয়েটি তাকে দুঃখ দিতে এসেছে।

নীনার ব্যবহার এমন, যেন মনে হয় কুলদীপ তার অনেক দিনের চেনা।

নীনা বললো যে, শুধু মেয়েদের একটি টিম মাকালু পর্বত অভিযানে যাবে বলে কথাবার্তা চলছে। নীনা সেই টিমে যেতে চায়, অমৃতাও হয়তো যেতে

পারে। ওরা কুলদীপের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে এসেছে।

কুলদীপ খানিকটা অবিশ্বাসের সঙ্গে বললো, শুধু মেয়েদের টিম!

নীনা অমনি ফস করে উত্তেজিত হয়ে উঠে বললো, কেন, মেয়েরা পাহাড়ে উঠতে পারে না? এর আগে একটা জাপানী অল উইমেন'স টিম সাকসেসফুল হয়নি?

কুলদীপ বললো, মেয়েরা পারবে না কেন, নিশ্চয়ই পারে। কিন্তু অনেক টেকনিক্যাল ব্যাপার থাকে। সেগুলোর জন্য ফিজিক্যাল স্ট্যামিনার দরকার হয়।

নীনা বললো, মেয়েদের স্ট্যামিনা কি পুরুষদের চেয়ে কম?

কুলদীপ হেসে ফেলে বললো, না, না, তা বলতে চাই না। তোমরা উইমেন্স লিব-এর প্রবক্তা নাকি?

নীনা বললো, আজকাল সব শিক্ষিত মেয়েই উইমেন্স লিব-এর সমর্থক।

অমৃতা তার বান্ধবীকে বললো, উইমেন্স লিব বলছিস কেন? আমরা কার কাছ থেকে লিবারেটেড হতে চাই? পুরুষদের কাছ থেকে? মোটেই না। পৃথিবীর সব ব্যাপারে আমরা আমাদের সমান অধিকার আদায় করে নেবো।

নীনা বললো, সমস্ত ফিল্ডে মেয়েরা তাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। একমাত্র কুস্তি কিংবা ঘুষোঘুষির মত কয়েকটা ভাল্‌গার ব্যাপার ছাড়া!

দুটি মেয়ে নিজেদের মধ্যেই কথা বলতে লাগলো। কুলদীপ বেশ কৌতুক বোধ করলো। ঠিক এ রকম মেয়েদের সঙ্গে সে আগে কখনো মেশেনি।

এক সময় নীনা বললো, এক্সপিডিশানের ব্যাপারে আমরা আপনার কাছ থেকে কিছু গাইডেন্স চাই। তার কারণ, আপনি পুরুষ বলে নয়, এই ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি।

কুলদীপ বললো, পাহাড়ে চড়ার গাইডেন্স পাহাড়ে গিয়েই দেওয়া যায়। শুধু আমার মুখের কথা শুনে কি করবে?

নীনা বললো, সে তো আমরা ট্রেইনিং নিচ্ছিই। আমরা শুনতে চাই আপনার অভিজ্ঞতার কথা।

টেবিলের কাগজ পত্রের দিকে হাত দেখিয়ে কুলদীপ বললো, আমার অভিজ্ঞতার কথা আমি কিছু কিছু লিখছি। আমি তোমাদের তার কপি দিতে পারি।

নীনা উঠে গিয়ে টাইপ করা কাগজগুলো নেড়ে চেড়ে দেখলো। তারপর বললো, আপনার মুখে শুনতেই আমাদের বেশি ভালো লাগবে। আমরা কি

আপনার সময় নষ্ট করছি ? আপনি ব্যস্ত ছিলেন ?

কুলদীপ বললো, না, না। সময়ের কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু কোথা থেকে শুরু করবো বলো তো ?

অমৃতা বললো, আমি যতদূর জানি, কোনো পীকের কাছাকাছি এসে ছোট ছোট গ্রুপ করে ক্লাইম্ব করাই নিয়ম। কিন্তু আপনি কখনো সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়েছেন ? তখন মনের অবস্থা কি রকম হয় ?

কুলদীপ বললো, অনেকবারই এ রকম হয়েছে। কিন্তু পাহাড়ে...

নীনা বললো, আগে একটু চা খেতে ইচ্ছে করছে। আপনি আমাদের চা অফার করবেন না ? আপনার রান্নাবান্না কে করে দেয় ? ঐ কাজের লোকটি ?

কুলদীপ বললো, হ্যাঁ। খুব দুঃখিত, তোমাদের চা খাওয়ানো উচিত ছিল আগেই।

সে গলা তুলে ডাকলো, শের সিং ! শের সিং !

নীনা বললো, পুরুষরা মোটেই চা বানাতে পারে না। আমি আপনার রান্নাঘরে যেতে পারি !

শের সিং দরজার কাছে উঁকি মারতেই নীনা তার সঙ্গে চলে গেল রান্নাঘরে।

একটু পরে সে একটা ট্রে-তে চা নিয়ে এলো তিন কাপ। হাসতে হাসতে বললো, শুধু চা। কোনো বিস্কুট বা চানাচুর খুঁজে পেলাম না।

কুলদীপ বিরক্ত হয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠলো, শের সিং, একটু চানাচুর দিতে পারোনি ? শিগগির দাও !

শের সিং কাচুমাচু ভাবে বললো, ফুরিয়ে গেছে। আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি।

নীনা বললো, থাক, এখন আনতে হবে না। তার মধ্যে চা শেষ হয়ে যাবে !

সেদিন মেয়ে দুটি চলে যাবার পর কুলদীপের মনে হলো, অনেক দিন তার এমন সুন্দর সময় কাটেনি। সন্ধেবেলা সে ব্যগ্র ভাবে জানলার ধারে বসে রইলো মোটর সাইকেলটা দেখার জন্য। এক সময় শোনা গেল সেই মোটর সাইকেলের গর্জন, নীনা পেছনে বসে আছে, এই জানলার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে। কুলদীপ মুখ না দেখিয়ে পর্দার আড়ালে রইলো।

দিন তিনেক পর আবার এলো নীনা। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, আসতে পারি ?

কুলদীপ টাইপ করছিল। মুখ ফিরিয়ে বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসো, এসো !

নীনা বললো, বাইরের দরজা খোলা ছিল। আপনার লোকটি কোথায় গেছে ?

কুলদীপ বললো, বোধহয় বাজারে গেছে। এসো, বসো। আজ যে তুমি একা ? তোমার বান্ধবী আসেনি ?

নীনা বললো, না, সে আজ আসেনি। আমি একলা এলে আপত্তি আছে ?

কুলদীপ বললো, আমার আপত্তি থাকবে কেন ? আমাদের দেশে সাধারণত মেয়েরা কোনো অনাত্মীয় পুরুষের ঘরে একলা আসে না। সেইজন্যই আগের দিন তুমি তোমার বান্ধবীকে নিয়ে এসেছিলে, তাই না ? তবে আমার কাছে কোনো ভয় নেই। আমার কাছে মেয়েরা সেফ।

নীনা কৌতুক-ঝলমল মুখে বললো, সেফ ? আমি তো ভেবেছিলাম, আপনি একটা বাঘ। আমাকে একলা দেখামাত্র আপনি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন !

কুলদীপ আর কিছু না বলে হাসলো।

নীনা রান্নাঘরে চলে গিয়ে একটা প্লেট নিয়ে এলো। কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা চানাচুরের প্যাকেট বার করে প্লেটে ঢেলে বললো, এটা খেয়ে দেখুন, এটা দিল্লির বেস্ট চানাচুর।

কুলদীপ বললো, সেদিন তুমি যে চা বানিয়েছিলে, তেমন চমৎকার চা আমি কখনো খাইনি !

নীনা বললো, আমি খুব ভালো বেগুনের ভর্তা বানাতে পারি। একদিন আপনাকে খাওয়াবো।

কুলদীপ বললো, উইমেন্‌স লিব আন্দোলন করে যে মেয়েরা, তারা আবার রান্নাও করে নাকি ?

নীনা বললো, মেয়েরা পুরুষদের সমকক্ষ হতে চায় সব ব্যাপারে, কিন্তু তারা পুরুষ হতে চায় না। রান্নাটা মেয়েরাই ভালো পারে।

কুলদীপ বললো, কিন্তু বড় বড় হোটেলে...

নীনা বললো, বড় বড় হোটেলে মেয়েদের চান্স দেওয়া হয় না। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, যে-কোনো ফাইভ স্টার হোটেলের শেফ-ও আমার মতন বেগুনের ভর্তা কিংবা বাটার-চিকেন বানাতে পারবে না।

কুলদীপ বললো, তা হলে তো একদিন খেয়ে দেখতেই হয়।

কথায় কথায় ওদের সম্পর্কটা অনেক সহজ হয়ে যায়। নীনার সঙ্গে কুলদীপের বয়েসের তফাত বেশি নয়। নীনার বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ, আর

কুলদীপের তেত্রিশ পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু বেশ কয়েকবার মৃত্যুর কাছাকাছি যাওয়ার অভিজ্ঞতা যেন কুলদীপকে প্রৌঢ় করে দিয়েছে, অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় তার একটা ভারিক্কি ভাব আসে। কিন্তু নীনার ছেলেমানুষি উচ্ছলতার কাছে কুলদীপও যেন অনেকটা ছেলেমানুষ হয়ে যায়।

নীনার পুরো নাম নীনা জ্যোতি তলোয়ার। তার বাবা একজন ব্যবসায়ী, ওদের বেশ আর্থিক সচ্ছলতা আছে মনে হয়।

নীনা মাঝে মাঝেই আসে। নানা রকম গল্প করে, কুলদীপের অভিজ্ঞতার কথা শোনে। আগামী গ্রীষ্মে নীনা নৈনিতালে ট্রেইনিং নিতে যাবে, তারপর শুরু হবে ওদের মাকালু এক্সপিডিশান। কুলদীপ এই ব্যাপারে নীনাকে খুব উৎসাহ দেয়।

শের সিং-এর সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেছে নীনার। ফ্ল্যাটে ঢুকেই জিজ্ঞেস করে, আজ কেয়া খানা পাকায়া, সিংজী ?

শের সিং সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বলে, ভালো বেগুন কিনে রেখেছি। কিন্তু ভর্তা বানাইনি, তুমি বানাবে, বহিনজী।

নীনা রান্না ঘরে ঢুকে যায় তক্ষুনি।

কুলদীপের মনে হয়, কতদিন সে কোনো নারীর হাতের রান্না খায়নি। সেই ছেলেবেলায় তার মায়ের হাতের রান্নার স্বাদ মুখে লেগে আছে। মায়ের এখন যথেষ্ট বয়েস, শরীর ভালো না, গ্রামের বাড়িতেও তিনি নিজে রান্না করেন না। কুলদীপের তিন দিদিও থাকে অনেক দূরে দূরে। মেয়েলি হাতের স্পর্শ না থাকলে ঘরোয়া রান্না ঠিক জমে না।

নীনার রান্না কুলদীপ উপভোগ করে বটে, আবার তার অবাকও লাগে।

নীনা একটি আধুনিক মেয়ে, যথেষ্ট পড়াশুনো করেছে, নারী-আন্দোলন করে, আবার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা দেয়, তার বন্ধুর সঙ্গে মোটর সাইকেলে অনেক দূর দূর ঘুরে বেড়ায়, তবু কেন সে রান্না ঘরে সময় নষ্ট করে ? এটা যেন ঠিক মেলে না। কুলদীপ তাকে রান্না করতে বারণ করলেও শোনে না।

এর মধ্যে নীনার বান্ধবী অমৃতা আরও দু'দিন এসেছিল। সে একটা মিশনারি হাসপাতালে অফিস সুপারের কাজ করে, সেখানে হ্যান্ডিক্যাপ্‌ড বাচ্চাদের চিকিৎসা হয়। সেই হাসপাতালে সে কুলদীপকে একদিন নিয়ে যেতে চায় দেখাতে। কুলদীপের সঙ্গে সে একটা রেডিও-ইন্টারভিউয়েরও পরিকল্পনা করেছে।

কুলদীপ লক্ষ করলো, অমৃতার আসাটা যেন নীনা পছন্দ করছে না।

অমৃতা যতবার তাকে হাসপাতাল দেখতে যাবার জন্য পেড়াপিড়ি করে, নীনা ততবারই চোখের ইঙ্গিতে কুলদীপকে বুঝিয়ে দেয়, যেতে হবে না। না বলে দাও!

অমৃতাকে কোনো ছুতোয় কাটিয়ে দিয়ে নীনা কুলদীপের সঙ্গে একা সময় কাটাতে চায়। কুলদীপের বেশ মজা লাগে। তাকে নিয়ে দুটি মেয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে, এটা প্রায় অবিশ্বাস্য। অবশ্য, ঐ দুই তরুণীর কাছে সে একজন পুরুষ মানুষ নয়, সে শুধু একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, একজন সেলিব্রিটি।

নীনা প্রায়ই আসে বলে কুলদীপের একটা সুবিধে হয়েছে। অনেকটা এগিয়েছে তার লেখাটা। নীনা তার লেখা সংশোধন করে, ঠিক ঠিক ভাষা জুগিয়ে দেয়, তার কাগজপত্র গুছিয়ে রাখে। শুধু ছুটির দিনেই নয়, অন্যান্য দিনেও সকালে অফিস যাবার আগে নীনা তার লেখায় সাহায্য করতে আসে।

কুলদীপ যখন স্নান খাওয়া করতে যায়, তখন নীনা কোনো কোনো কাটাকুটি করা পৃষ্ঠা রি-টাইপ করে।

পাশের ঘর থেকে জামা-প্যান্ট পরে শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে হুইল চেয়ার চালিয়ে এ ঘরে এলো কুলদীপ। আলাদা আলাদা বোতাম, একটা টুপ করে খসে পড়ে গেল মাটিতে। এ এক মহা বিপদ। চেয়ার থেকে ঝুঁকে মাটি থেকে কোনো জিনিস তোলা মুস্কিল। বিশেষত এত ছোট জিনিস। আবার একটা সামান্য বোতাম তুলে দেবার জন্য কারুকে ডাকতেও লজ্জা করে। অতি কষ্টে নুয়ে কুলদীপ বোতামটাকে ধরবার চেষ্টা করলো। খুব ছোট জিনিস এখনো কুলদীপ ভালো করে দু'আঙুলে ধরতে পারে না, বোতামটা পিছলে পিছলে দূরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কুলদীপ সেটা তুলবেই! সেও হুইল চেয়ারটা চালিয়ে চালিয়ে তাড়া করতে লাগলো বোতামটাকে। সারা ঘর জুড়ে যেন বোতামটার সঙ্গে তার এক খেলা চলছে।

নীনা টাইপ করছিল, প্রথমে বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা। এক সময় সে চোখ তুলে তাকালো। কি হচ্ছে ব্যাপারটা? তারপর বোতামের সঙ্গে ঐ খেলা দেখে সে খিলখিল করে হেসে উঠলো খুব জোরে।

কুলদীপ লজ্জা পেয়ে মুখ তুলে বললো, এই একটা মহা পাজি বোতাম!

নীনা উঠে এসে বললো, আমি পরিয়ে দিই?

মাটি থেকে বোতামটা তুলে নীনা সেটা কুলদীপের জামায় পরিয়ে দিতে গেল। বোতামটার তুলনায় জামার ঐ গর্তটা একটু ছোট, পরাতে সময়

লাগছে। কুলদীপের একেবারে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে নীনা। অনেক দিন কোনো নারীর সঙ্গে কুলদীপের শরীরের সংস্পর্শ ঘটেনি। সে পাচ্ছে নীনার শরীরের ঘ্রাণ। কুলদীপের বুক কেঁপে উঠলো, নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে এলো। সে এক দৃষ্টিতে দেখছে নীনার ঝুঁকে আসা মুখখানা।

একসময় কুলদীপ আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। সে একটা হাত উঁচু করে রাখলো নীনার গালে। নীনা সামান্য চমকে উঠলেও মুখটা সরিয়ে নিল না। কুলদীপ টের পেল, তার হাতটা গরম, নীনার গালটাও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

বোতাম লাগানো হয়ে গেছে, নীনা কুলদীপের চোখে চোখ রেখেছে। তার ঠোঁটে চাপা হাসি, কেমন যেন বদলে গেছে মুখের রং। কুলদীপ নীনার দু'গালে, ঠোঁটে, থুতনিতে, গলায় হাত বুলোতে লাগলো খুব কোমল ভাবে।

এক সময় কুলদীপ ডাকলো, নীনা—

নীনা তার মুখটা আরও নিচু করে আনলো। কুলদীপের মুখের কাছে।

কুলদীপের সারা শরীরে একটা ঝাঁকুনি লাগলো। এ কী করছে সে? তাড়াতাড়ি চেয়ারটা চালিয়ে চলে গেল টেবিলের কাছে। ব্যস্ত হয়ে কাগজপত্র খোঁজার ভান করতে করতে বললো। আই অ্যাম সরি, নীনা। আই অ্যাম সরি।

নীনা কাছে এসে কুলদীপের হাতের ওপর নিজের একটা হাত রেখে বললো, কি খুঁজছো?

কুলদীপ হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললো, দেরি হয়ে গেছে। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

তারপর সে গলা চড়িয়ে ডাকলো, শের সিং! শের সিং!

নীনা বললো, তুমি অফিসে চলে যাও, আমি এখানে বসে টাইপটা সেরে ফেলি?

সেদিন সারাক্ষণ কুলদীপের বুকের মধ্যে একটা তোলপাড় হতে লাগলো। তার শরীরের মধ্যে হাত-পা বাঁধা একটা দুরন্ত ইচ্ছে যেন মুক্তি পেতে চাইছে। কিন্তু কুলদীপের নিজের ভেতরের সেই বন্দীটাকেও মুক্তি দেবার ক্ষমতা তার নেই।

কুলদীপ বুঝতে পারছে, সে সাধ করে আবার একটা দুঃখকে ডেকে আনছে তার জীবনে। আবার একটা আঘাত পেতে হবে।

এই কয়েকটা সপ্তাহে নীনার সঙ্গে যে একটা বেশ সাবলীল বন্ধুত্বের সম্পর্ক

গড়ে উঠেছিল, তাতেই কুলদীপ যথেষ্ট আনন্দ পাচ্ছিল। নীনা তাকে রান্না করে খাওয়ায়, তার লেখায় সাহায্য করে, নানা রকম গল্প করে, কুলদীপও তাকে পাহাড়-অভিযানে প্রেরণা দেয়। ঘরের মধ্যে নীনার উপস্থিতিটাই সুখকর। কিন্তু নিছক সহজ বন্ধুত্ব কি সম্ভব নয়? কেন একটু স্পর্শের জন্য আকুলি-বিকুলি? আর এগোলে কুলদীপ আর বেশি কিছু পাবে না, নীনা দূরে চলে যাবে।

এর পরের কয়েকটা দিন কুলদীপ নীনার সামনে আড়ষ্ট হয়ে রইলো। নীনা এলেও নিছক কাজের কথা বলে, কোনোক্রমে যাতে নীনার হাতের সঙ্গেও তার হাতের ছোঁয়া না লাগে, সে জন্য সাবধানে থাকে। নীনা বেশিক্ষণ থাকতে চাইলে সে কিছু একটা ছুতো করে শের সিংকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়

অফিসে এখন খুব কাজের চাপ। আগামী সপ্তাহে পার্লামেন্টে বাজেট পেশ হবে। ডিফেন্সের বাজেট কমবে না বাড়বে, তাই নিয়ে সর্বক্ষণ গুঞ্জন চলছে এই অফিসে। তার ওপর এখানকার অনেক কিছু নির্ভর করে। কেউ কেউ টেনে আনছে জওহরলাল নেহরুর আমলের কথা। নেহরু পঞ্চশীল নীতিতে আস্থা রেখে প্রতিরক্ষা বাজেট কমিয়ে দিয়েছিলেন, অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদনও কমিয়ে দিয়ে অরড্‌নান্স ফ্যাকট্রিগুলোকে ডাইভারসিফাই করা হয়েছিল। তার ফলে, চীনের সঙ্গে আচমকা যুদ্ধে প্রচণ্ড মার খেতে হয়েছে। মেনে নিতে হয়েছে পরাজয়ের লজ্জা। তারপর এই সেদিন পাকিস্তানের সঙ্গে একটা যুদ্ধ হয়ে গেল। চীন আর পাকিস্তান, এই দু দেশই এখন ভারতের শত্রু, যে-কোনো দিন আবার লড়াই বাধতে পারে। তাই ডিফেন্স বাজেট এবার অন্তত দ্বিগুণ করা দরকার। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিশ্চয়ই সেটা বুঝবেন।

কুলদীপ এমন আলোচনায় অংশগ্রহণ করে না। সে লক্ষ করেছে, অতি সাধারণ, নিরীহ মানুষ, যারা অন্য সময় দেশ নিয়ে মাথা ঘামায় না, তারাও যুদ্ধের কথা শুনলেই দেশপ্রেমিক হয়ে যায়। যারা নিজেরা কোনো দিন নিজের হাতে যুদ্ধ করবে না, কোনো দিন রণক্ষেত্র চোখেও দেখবে না, তারাই যুদ্ধ-উন্মাদনায় ভোগে। যুদ্ধ যে কী জিনিস, তা যারা নিজেদের মৃত্যু মাথায় নিয়ে অন্য পক্ষকে মারতে যায়, তারাই বোঝে। হাজার হাজার তরতাজা জীবন ও জাতীয় সম্পদের কি অপচয়, কি অপচয়।

চীন-ভারত-পাকিস্তান, এই তিনটেই গরিব দেশ। এই তিন দেশের নেতারা মিলে দীর্ঘমেয়াদী অনাক্রমণ চুক্তি করে নিতে পারে না? যত মতবিরোধই হোক, তার মীমাংসার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া হবে না, এইটুকু মেনে নিলেই এই

তিন দেশের শত কোটি কোটি টাকা বেঁচে যায়, যা দিয়ে গরিবমানুষদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটানো যেতে পারে। এই অতি সাধারণ কথাটা নেতারা বোঝে না ? যত সব বদমাশ !

পাঁচটা বেজে গেছে, কুলদীপ তবু নিজের চেম্বারে বসে কাজ করে যাচ্ছে। দুবে উঁকি মেরে বললো, কি ব্যাপার, মেজর সিং, আপনি যে আমাদের সবাইকে লজ্জায় ফেলে দিচ্ছেন ! আপনি যখন জয়েন করেন, তখন কথা ছিল আপনাকে হাল্‌কা কাজ দেওয়া হবে।

কুলদীপ হেসে বললো, আমি কি গর্ভিণী স্ত্রীলোক যে আমাকে হাল্‌কা কাজ করতে হবে ?

দুবে বললো, চলুন, এবার উঠে পড়ুন। আজ আবার লিফ্‌টটা খারাপ হয়ে গেছে। আপনার চেয়ারটা আমি সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে দিচ্ছি।

কুলদীপের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে গেল। মাঝে মাঝে তার নিজের পঙ্গুত্বের কথা মনেই থাকে না। কিন্তু এই রকম কিছু ঘটলেই আবার মনে পড়ে যায়। হার্টের রুগীদেরও সিঁড়ি দিয়ে নামতে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু কুলদীপ অসহায়, সে পারে না।

কুলদীপ দুবেকে বললো, ধন্যবাদ। আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। দেখুন, আমার ব্যাটম্যান শের সিং নিশ্চয়ই নীচে অপেক্ষা করছে। আপনি যাবার সময় তাকে শুধু ডেকে দেবেন।

শের সিং এসে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে তাকে গাড়িতে তুললো। হঠাৎ আজ বৃষ্টি নেমেছে। একেবারে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। একটুক্ষণ চলার পরেই কুলদীপের মনে হলো, পাশের একটা মোটর বাইক থেকে কে যেন তার দিকে হাত নাড়ছে।

জানলার কাচ তোলা, সেটা নামাতেই কুলদীপ দেখলো মোটর বাইকে একজন পুরুষের পেছনে বসে আছে নীনা। দু'জনেই ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে। নীনার গায়ের সঙ্গে লেপ্টে গেছে তার তুঁতে রঙের শাড়ি। নীনা তার এই বন্ধুটিকে কখনো কুলদীপের বাড়িতে নিয়ে আসে না।

নীনা চেঁচিয়ে বললো, আমার বন্ধু, এর নাম দীপক সোঙ্কি। তোমার সঙ্গে আলাপ হয়নি।

সুদর্শন যুবকটি এক হাত ছেড়ে দিয়ে কপালের কাছে এনে বললো, নমস্তে ! এখন বাড়ি ফিরছেন ?

অন্য গাড়ির আওয়াজে কথা শোনা যাচ্ছে না। একটু পরে এক জায়গায়

ট্রাফিকের লাল আলোয় সব গাড়ি থামলো। দীপক তার মোটর বাইকটাকে কুলদীপের গাড়ির সামনে এনে বললো, মিঃ সিং একদিন আপনাকে আমাদের বাড়ি যেতে হবে। আমার মা-বাবা আলাপ করতে চান আপনার সঙ্গে। কবে যাবেন বলুন।

কুলদীপ এসব আমন্ত্রণ এড়িয়ে যায়। দায়সারাভাবে বললো, যাবো। এখন কয়েকটা দিন একটু ব্যস্ত আছি। আপনারা এত ভিজছেন কেন?

দীপক বললো, আমরা এখন ওখলা যাচ্ছি। আপনি যাবেন আমাদের সঙ্গে?

কুলদীপ হেসে দুদিকে মাথা নাড়লো। তার শরীরের সব যন্ত্রপাতি এখনো সম্পূর্ণ জোরালো নয়। একটু ঠাণ্ডা লেগে গেলেই অসুস্থ বোধ করে। বৃষ্টিতে ভেজার প্রশ্নই ওঠে না।

নীনা বললো, চলো না, চলো। বেশিক্ষণ না।

কুলদীপের মুখ থেকে হাসিটা মিলিয়ে গেল। কোনো কথা না বলে সে মাথা নাড়তে লাগলো দুদিকে।

ট্রাফিকের আলো বদলে গেল। সমস্ত গাড়ি আবার গর্জন করে ছুটলো সামনে। দীপক নীনাদের মোটর সাইকেলটা হারিয়ে গেল কুলদীপের দৃষ্টি থেকে।

কুলদীপ মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে চোখ বুজলো।

একটু বাদে সে আবার সোজা হয়ে বললো, শের সিং, এখন ঘরে যাবো না, সোজা চলো।

অফিসের গাড়ির ড্রাইভার কুলদীপকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে চলে যায়। সে ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবো স্যার?

কুলদীপ বাইরে তাকিয়ে বললো, জয়পুর রোড ধরে নাও।

দিল্লি শহর ছাড়িয়ে ছুটছে গাড়ি। ড্রাইভার বা শের সিং কোনো কথা বলছে না। বৃষ্টি প্রায় থেমে এসেছে। মিলিয়ে যাচ্ছে বিকেলের আলো।

রাস্তার দুদিকে শুধু ফাঁকা মাঠ। এক জায়গায় কুলদীপ হঠাৎ বললো, এইখানে থামো। শের সিং, চেয়ারটা নামাও।

একটা ঝাঁকড়া ছাতিম গাছের নীচে থামলো গাড়িটা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। শের সিং কুলদীপকে চেয়ারে বসালো। তারপর একটা ছাতা মেলে ধরে ঠেলতে গেল চেয়ারটা।

কুলদীপ বললো, তোমাকে আসতে হবে না। ছাতাও লাগবে না।

সে নিজেই চেয়ারটা চালিয়ে নেমে পড়লো ডান দিকের মাঠে। পশ্চিম আকাশে দারুণ বর্ণাঢ্যভাবে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। দিগন্তে কয়েকটা ছোট ছোট টিলা। কুলদীপ চেয়ারটা চালিয়ে চালিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগলো সেই মাঠের মধ্যে।

ক্রমে অন্ধকার হয়ে এলো। গাড়িটা আর দেখা যাচ্ছে না। কুলদীপ সেই মাঠটার মধ্যে একটা সীমানা এঁকে ঘুরে যাচ্ছে অনবরত। আপনমনে। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন ভাবে।

এক সময় সে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে রইলো। তার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না।

॥১১॥

(জল যেমন জলকে টানে, সেইরকম যৌবনও টানে যৌবনকে।) কুলদীপ বয়েসে যুবক হলেও তার যৌবন নেই।

নীনা আটদিন আসেনি। এরকম হয়নি আগে, সে একদিন দুদিন অন্তর আসতোই। তার আসাটা কুলদীপের অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। কুলদীপ কখনো বদ-মেজাজ দেখালে নীনা উল্টে ধমক দিত তাকে। কুলদীপকে লেখাটা শেষ করার জন্য তাড়া দিত। তবে কেন সে আসছে না।

কুলদীপ মনে মনে নীনার পক্ষ নিয়ে যুক্তি খাড়া করে। কেন সে আসবে? তার নিজের বন্ধু বান্ধব আছে, একজন নির্দিষ্ট বয় ফ্রেন্ড আছে, তাদের ছেড়ে কুলদীপের সঙ্গে সময় কাটাতে তার ভালো লাগবে কেন? মাঝখানে কিছুদিন একটা ঝোঁক চেপেছিল, কুলদীপের লেখাটা সম্পর্কে খানিকটা আগ্রহ জন্মেছিল, এখন সেই ঝোঁক কেটে গেছে। এটা তো খুব স্বাভাবিক।

সেদিন ওখলায় গিয়ে ওরা দুজনে খুব মজা করেছে নিশ্চয়ই। অত বৃষ্টির মধ্যে সেখানে কি আর মানুষ জন ছিল? কুলদীপ যেন স্পষ্ট দেখতে পায়, নির্জনতার মধ্যে দুটো ভিজে শরীর। মাঝে মাঝে ঘাসে শুয়ে জড়াজড়ি করছে, চুমু খাচ্ছে। পাগলের মতন। এমন তো করবেই। (যৌবনে সবই মানায়। এমনকি ছোট খাট অন্যায়ও মানিয়ে যায়।) অবশ্য চুমু খাবার মধ্যে অন্যায় কি আছে? দার্জিলিং-এর নির্জন রাস্তায় রবির চোখ এড়িয়ে কুলদীপ গীতাকে চুমু খায়নি কয়েকবার?

রাত্রে বিছানায় শুয়েও কুলদীপ মাথা থেকে দীপক আর নীনার জড়াজড়ির দৃশ্যটা তাড়াতে পারে না। নীনা কতটা আদর করেছিল দীপককে? কেন এটা

কুলদীপ ভুলতে পারছে না, এ কি তার ঈর্ষা ? কুলদীপ কি পাগল হয়ে গেল নাকি ? এখানে তার ঈর্ষার স্থান কোথায় ? বাংলায় একটা কথা আছে, 'বামন হয়ে চাঁদে হাত', কুলদীপ কলকাতায় শুনেছে। কুলদীপ তো এখন সত্যিই বামন। আগে সে পাঁচ ফিট এগারো ইঞ্চি লম্বা ছিল, এখন সাড়ে তিন ফিট। জীবনে আর কোনোদিন সে দুপায়ে দাঁড়াবে না।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই কুলদীপের মনে হলো, নীনা একেবারেই আকস্মিকভাবে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিল। এমন কি ঘটে গেল এর মধ্যে ? সেই যে জামার বোতাম পরাবার দিন কুলদীপ ওর গাল ছুঁয়েছিল, তার জন্য বিরক্ত হয়েছে ? তার পরেও তো এসেছিল দু তিন দিন ওর বন্ধু সেই দীপক আসতে বারণ করেছে ? এই পথ দিয়ে ওরা মোটর সাইকেলেও আর যায় না।

ব্রেক ফাস্ট দেবার সময় শের সিং জিজ্ঞেস করলো, নীনা বহিনজী আর আসছে না কেন ? তার কি অসুখ করেছে ?

কুলদীপ চমকে উঠলো, তাই তো, এ সম্ভাবনার কথা তার মাথায় আসেনি কেন ? সেদিন নীনা অত বৃষ্টি ভিজেছিল। কুলদীপের ফ্ল্যাটে এখনো টেলিফোন রাখেনি, তাই খবরও দিতে পারেনি।

নীনার বাড়ি বেশি দূরে নয়, শের সিং চেনে।

কুলদীপ বললো, একটা ট্যাক্সি ডেকে আনো, এক্ষুনি বেরুবো।

এ পাড়াতেই একজন ট্যাক্সিচালক থাকে, তার সঙ্গে শের সিং-এর বেশ ভাব হয়ে গেছে সময়ে-অসময়ে তাকে পাওয়া যায়। তার নাম গাব্বু মানালা। লোকটি কুলদীপকে এমনই পছন্দ করে যে ভাড়াও নিতে চায় না। কুলদীপ অবশ্য জোর করে তার পকেটে টাকা গুঁজে দেয়। গাব্বুকে পাওয়া গেলে শের সিংকে সঙ্গে নেবার দরকার হয় না, সে-ই কুলদীপের চেয়ারটা তুলে দেয়, নামিয়ে দেয়।

আজ অবশ্য শের সিংকে নিতে হলো, সে বাড়িটা চিনিয়ে দেবে।

পুরনো আমলের বাংলো ধরনের বাড়ি। সামনে অনেকখানি সবুজ লন, একপাশে নানা আকারের পাথর সাজানো, অনেকটা রক গার্ডেনের মতন। একটা দোলনাও রয়েছে।

ড্রাইভওয়ে দিকে একটা পোর্টিকোর সামনে থামতে হয়। তারপর একটা খোলা বারান্দা, পাঁচ ধাপ সিঁড়ি ওপরে বাগানের গেট খোলাই ছিল, ভেতরে এসে ট্যাক্সিটা থামতেই কোথা থেকে একজন দারোয়ান চলে এলো, কুলদীপের নামটা লক্ষ করলো। কুলদীপ নীনার বাবার নাম বলতেই দারোয়ান বললো,

আপ অন্দর যাইয়ে।

কিন্তু ট্যাক্সি ওখানে রাখা যাবে না। গাব্বু মানালো আর শের সিং জানালো যে তারা গেটের বাইরে অপেক্ষা করবে। শের সিং তার চেয়ারটা বারান্দায় তুলে দিল।

কুলদীপ এগিয়ে গিয়ে বেল টিপলো একটা দরজার।

একজন পরিচারিকা শ্রেণীর মেয়ে খুললো দরজা। হুইল চেয়ারে বসা একজন শিখ যুবককে দেখে সে শুধু অবাকই হলো না, যেন ভয়ও পেয়ে গেল। কুলদীপ কিছু বলার আগেই দ্রুত ভেতরে চলে গেল মেয়েটি।

এরপর এলেন এক সাজগোজ করা মহিলা। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েস, ইনি বাড়িতে থাকার সময়ও লিপস্টিক মাখেন। কুলদীপ বুঝলো খুব সম্ভবত ইনি নীনার মা, নীনা যদিও তার বাবা মা ভাই-বোনদের কথা বলতে চায় না, কুলদীপ দু একবার জিজ্ঞেস করেছে, নীনা তখন হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছে, আমি যা, আমি তাই-ই, আমি আমার বাবা-মায়ের পরিচয়ে কিংবা পারিবারিক পরিচয়ে কোথাও যাই না।

সেই মহিলা তার সূক্ষ্ম আঁকা ভুরু তুলে বললেন, ইয়েস?

কুলদীপ বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলো, মিঃ তলোয়ার বাড়িতে আছেন কি?

মহিলা বললেন, উনি তো এসময় বাড়ি থাকেন না।

কুলদীপ বললো, আমার নাম কুলদীপ সিং, আপনি কি মিসেস তলোয়ার? আপনাদের সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলাম। আপনি বোধহয় জানেন, আপনাদের মেয়ে নীনা মাঝে মাঝে আমার কাছে যায়। মাউন্টেনিয়ারিং-এর ব্যাপারে গাইডেন্স নেবার জন্য।

কুলদীপের নাম শুনে মহিলার মুখে কোনো রেখাপাত হলো না।

কুলদীপ লক্ষ করেছে যে দিল্লির সমাজে কোথাও কোথাও সে এভারেস্টজয়ী মেজর কুলদীপ সিং হিসেবে বেশ খাতির পায়। আবার অনেক জায়গাতেই তার নাম শুনেও বিশিষ্ট ভদ্রলোক মহিলারা পাত্তা দেয় না নাম শুনে চেনে না। অন্য কেউ পরিচয় করিয়ে দিলেও তারা এমন ভাব দেখায়, যে এভারেস্ট জয় করেছে তো এমন কি হয়েছে? এখন তো লোকটা একটা পঙ্গু।

নীনার মা-ও নীরস ভদ্রতার গলায় বললেন, নীনা এখন অসুস্থ।

তিনি পুরো দরজা খোলেননি। কুলদীপকে অভ্যর্থনা জানাবার কোনো আগ্রহই তাঁর নেই। কুলদীপ কি এখান থেকে ফিরে যাবে? নীনা কতটা

অসুস্থ ? নীনা কি জানতে পারবে যে কুলদীপ এসেছিল ?

কুলদীপ খুবই দ্বিধার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, একবার কি নীনার সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে ? যদি ডাক্তারের আপত্তি থাকে, তাহলে দরকার নেই।

মহিলা কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন কুলদীপের দিকে। বললেন, ও বোধহয় এখন ঘুমিয়ে আছে।

তবু এবার দরজা খুলে দিয়ে বললেন, আসুন।

একতলা বাড়ি, ভেতরে অনেকগুলো প্রশস্ত ঘর। দিল্লিতে এরকম একতলা বাংলো আর বিশেষ অবশিষ্ট নেই। এই সব বাড়ি ভেঙে মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং উঠছে।

মাঝখান দিয়ে বারান্দা, দুদিকে ঘর। নীনার ঘরটি সবচেয়ে শেষে। সেদিকে যেতে যেতে কুলদীপ জিজ্ঞেস করলেন, ওর কী অসুখ হয়েছে ?

মহিলা বললেন, প্রচণ্ড জ্বর, আর গায়ে ব্যথা। জ্বরটা কমছে না কিছুতেই। আর মেয়েও এমন জেদী, ওষুধ খাবে না কিছুতেই। ওদের কী একটা গ্রুপ আছে, তারা অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খাওয়ার বিরোধী। নেচারস কিওর না কীসব বুলশীটে বিশ্বাস করে।

নীনার ঘরের দরজাটা ভেজানো। খুলতেই দেখা গেল, একটা খাটে সাদা চাদর গায়ে দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছে নীনা। কুলদীপ এর আগে কখনো নীনাকে শুয়ে থাকা কিংবা চোখ বোজা অবস্থায় দেখেনি। এ যেন অন্য এক নীনা। ঘুমন্ত রাজকন্যা।

নীনা যদি তখনই চোখ না মেলতো, তাহলে কুলদীপকে দরজার কাছ থেকেই ফিরে আসতে হতো।

নীনা তক্ষুনি চোখ মেলে তাকালো।

কুলদীপ বললো, কেমন আছো, নীনা ?

নীনা একটুখানি মাথা তুলে বিস্ময়ভরা চোখে বললো, কুলদীপ ? আমার অসুখ হয়েছে, আমি মরে যাচ্ছি। তুমি আমাকে এতদিন দেখতে আসোনি কেন ?

কুলদীপ অপরাধীর মতন বললো, আমি তো জানতাম না। আমি খবর পাইনি।

নীনা বললো, কেন খবর পাওনি ? আমি তোমাকে চিঠি লিখেছি।

নীনার মা মৃদু বকুনি দিয়ে বললেন, বেশি বাড়াবাড়ি করিস না। মরে যাচ্ছিস আবার কি ! বৃষ্টি ভিজে জ্বর হয়েছে।

কুলদীপের দিকে ফিরে বললেন, আপনি ওকে বুঝিয়ে বলুন তো ঠিকমতন ওষুধ খেতে।

নীনার ঘরটা শুধু বই আর মিউজিক ক্যাসেটে ভর্তি। এত ক্যাসেট কোনো দোকান ছাড়া আর কোনো বাড়িতে দেখেনি কুলদীপ। একদিকের দেওয়াল জোড়া হিমালয়ের একটা ব্লো-আপ করা ফটোগ্রাফ।

সেদিকে একবার তাকিয়ে কুলদীপ বললো, তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো। তোমাকে তো ট্রেইনিং-এ যেতে হবে।

নীনার মা বললেন, ওসব পাহাড়-টাহাড়ে চড়া ওর চলবে না।

নীনার মায়ের কণ্ঠস্বরে একটা খটখটে ব্যাপার আছে। দিল্লির উঁচু সমাজের মহিলাদের মতন টিপিক্যাল ধরনধারন। কয়েক মিনিটেই কুলদীপ বুঝে গেল, মায়ের থেকে নীনা অনেক আলাদা।

নীনা বললো, মা, আমার বন্ধুর জন্য একটু কফি বানিয়ে দিতে বলবে রোশনিকে? দুধ-চিনি ছাড়া!

মা বললেন, তোমরা কথা বলো। আমি কফি পাঠিয়ে দিচ্ছি! নীনা, ওভারস্ট্রেইন করো না। একটু পরে তোমার খাবার সময়।

মা বেরিয়ে যেতেই নীনা বললো, কুলদীপ আরও কাছে এসো। আমি ভালো করে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।

কুলদীপ চেয়ারটা চালিয়ে নীনার শিয়রের কাছে চলে এলো।

নীনা জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমার চিঠি পাওনি?

কুলদীপ বললো, না। তোমার এখনো কি খুব জ্বর? কপালে হাত দিয়ে দেখবো?

নীনা বললো, কপালে হাত দিতে বুঝি পারমিশান লাগে?

কুলদীপ ওর কপালে হাত দিল। হ্যাঁ, বেশ জ্বর আছে। নীনা কুলদীপের হাতটা টেনে আনলো নিজের গালে।

কুলদীপ ওর গালে, গলায়, চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

চাদরটা সামান্য সরে গেছে। নীনা প্রায় স্বচ্ছ একটা সাদা পোশাক পরে আছে। নিঃশ্বাসে দুলছে ওর সুমেরু চূড়ার মতন দুই স্তন। কুলদীপ বুঝতে পারছে যে তারও হাত, চোখ, কান গরম হয়ে উঠছে, নীনার শরীরের তাপ আসছে তার শরীরে।

কুলদীপ হাতটা সরিয়ে নিতেই নীনা বললো, আমাকে আর একটু আদর করো। তোমার ছোঁয়া এত ভালো লাগছে।

কুলদীপ চাদরটা টেনে দিল নীনার গলা পর্যন্ত। সে নীনার বুক দেখতে চায় না। যদি নিজেকে সামলাতে না পারে। সে নীনার মুখে শুধু হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলো।

একটু পরেই একটা খটখট শব্দ হলো বারান্দায়। ভারী জুতো পরে কেউ আসছে। কুলদীপ দ্রুত নিজের হাতটা সরিয়ে নিলেও নীনা আবার হাতটা চেপে ধরলো। মুখ থেকে সরিয়ে বিছানার এক পাশে ধরা রইলো দু'জনের হাত।

ঘরে ঢুকলো দীপক। প্রথমে সে কুলদীপকে লক্ষই করলো না। দরজা থেকেই বলতে বলতে ঢুকলো, হাই নীনা। ইউ লুক মাচ বেটার টুডে।

নীনার শিয়রের অন্য পাশে এসে সে ঝুঁকে পড়ে নীনার একটা চোখ অনেকখানি ফাঁক করে দেখে বললো, চোখের রং অনেক স্বাভাবিক হয়ে এসেছে!

নীনা বললো, তুমি বুঝি ডাক্তার?

দীপক এক ঝলক দেখলো নীনা ও কুলদীপের দুজনের মুঠো করা হাত।

তারপর সে কুলদীপকে বললো, কেমন আছেন, মিস্টার সিং? নীনা বলছিল, আপনি কারুর বাড়িতে যান না। এখানে এসেছেন, এটা নীনার প্রতি স্পেশাল ফেভার, তাই না?

কুলদীপ এবার নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল। মৃদু গলায় বললো, অনেকদিন ওর কোনো খবর পাইনি।

নীনার মা আবার ফিরে এলেন, তার পেছনে পরিচারিকার হাতে কুলদীপের কফি।

দীপককে দেখে নীনার মা স্পষ্টত খুশি হয়ে বললেন, কখন এলে? নটি বয়, কাল সন্ধেবেলা আসোনি। আমরা সবাই তোমাকে এক্সপেক্ট করছিলাম। নীনার ড্যাডি বলছিলেন, আমরা একসঙ্গে ডিনার খাবো। বসো, বসো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

কুলদীপের দিকে একবার তাকিয়ে তিনি নীনাকে বললেন, নীনা এবার কিন্তু তোমার খাওয়ার সময় হয়ে গেছে।

বাতাসে একটা ভাইব্রেশান থাকে, তাতেই টের পাওয়া যায় যে এখানে কুলদীপের উপস্থিতি নীনার মায়ের পছন্দ নয়। দীপকও হয়তো চায় না। কুলদীপ গরম কফিতে বড় বড় চুমুক দিতে লাগলো। পাঁচ চুমুকে শেষ করে বললো, নীনা, আমি যাচ্ছি।

নীনা বললো, আর একটু বসো।

কুলদীপ বললো, না, আমাকে এখন যেতে হবে।

নীনার মা বললেন, দীপক, তুমি এখানে থাকো, আমি মিঃ সিংকে এগিয়ে দিচ্ছি।

নীনার দিকে আর তাকালো না কুলদীপ। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। নীনার মা পিছু পিছু আসছেন। বাইরের বারান্দাটার প্রান্তে এসে কুলদীপ থামলো। পাঁচটা সিঁড়ি নামতে হবে। শের সিং আর ট্যাক্সি ড্রাইভার অপেক্ষা করছে গেটের বাইরে রাস্তায়, ওদের ডাকবে কে?

নীনার মা বললেন, আমি আপনার চেয়ারটা ধরে নামিয়ে দেবো?

কুলদীপ বললো, প্লিজ নো। আই ক্যান ম্যানেজ মাইসেলফ।

চেয়ারটাকে সে চালিয়ে দিল সামনের দিকে। সেটা লাফাতে লাফাতে নামতে লাগলো। যে-কোনো মুহূর্তে উল্টে পড়তে পারে। কুলদীপ দাঁতে দাঁত চেপে বললো, উল্টোক, যা খুশি হোক। সে আর এ বাড়িতে কোনোদিনও আসবে না।

চেয়ারটা নীচে পড়ে গড়িয়ে গেল লনে। কুলদীপ ব্রেক কষে মুখটা ঘোরালো। তারপর আবার দুরন্ত গতিতে চালিয়ে দিল গেটের দিকে।

বাড়িতে ফেরার পর কুলদীপ অনেক শান্ত হয়ে গেল।

সবটাই তো তার নিজের ভুল। কেন সে নীনার সঙ্গে নিজেকে এত জড়াচ্ছে? নীনাদের বাড়ির পরিবেশ সে দেখে এলো, সেখানে দীপকের মতন ছেলেকেই মানায়। দীপকের ব্যবহার দেখলে মনে হয়, নীনার প্রতি ওর একটা অধিকার জন্মে গেছে। টু ইজ কমপানি, থ্রি ইজ ক্রাউড। ওদের দুজনের জীবনে কুলদীপ অবাঞ্ছিত তৃতীয় পুরুষ হতে যাবে কেন? তা ছাড়া, দীপকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামার কোনো যোগ্যতাই তো তার নেই। প্রথম থেকেই কুলদীপ হেরে বসে আছে।

নীনার সঙ্গে আর দেখা না হওয়াই ভালো। সবচেয়ে ভালো হয়, কিছুদিনের জন্য দিল্লি ছেড়ে চলে গেলে। কুলদীপের বড় দিদি থাকেন কলকাতায়। ভবানীপুর অঞ্চলে বেশ বড় বাড়ি আছে দিদিদের। কুলদীপ একসময় সেখানে থেকে স্কুলে পড়েছে। কলকাতায় অরডন্যান্স ফ্যাকট্রিতে ট্রান্সফার নেওয়া যেতে পারে।

নীনা এলো তিনদিন বাদেই। জিনসের প্যান্ট আর একটা ভয়েলের শার্ট পরে এসেছে। বোঝাই যায় না, সে এতদিন অসুস্থ ছিল। শুধু মুখখানা হালকা

হালকা।

তাকে দেখে শের সিং খুব খুশি। নীনাকে সঙ্গে নিয়ে কুলদীপের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললো, বহিনজী, এবার কদিন পেস্তা মালাই আর আন্ডা সেদ্ধ খাও দুটো করে। শরীরে তাগত ফিরে আসবে।

নীনা বললো, আমার শরীরে যথেষ্ট তাগত আছে। আর দু সপ্তাহ বাদে পাহাড়ে যাবো।

কুলদীপ বসে আছে টেবিলে টাইপ রাইটার সামনে নিয়ে। এই কদিনে সে আর একটা অক্ষরও লেখেনি। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো নীনার দিকে। তার বুক কাঁপছে।

নীনা জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমাকে দেখতে আর গেলে না কেন?

কুলদীপ কোনো উত্তর দিল না। তাকিয়েই রইলো।

নীনা বললো, বুঝতে পেরেছি। আমার মায়ের ব্যবহার তোমার পছন্দ হয়নি। আমার মা ওই রকমই। ভেইন জীবন কাটাচ্ছে। বাবাও অনেকটা তাই। টাকা রোজগারের নেশায় পাগল, কিন্তু টাকার বেস্ট ইউটিলিটি কি, তা জানে না। এরা সর্বক্ষণ জীবনটাকে উপভোগ করতে চায়, কিন্তু জীবনের মর্মই বোঝে না। উপভোগের ব্যাপার-স্যাপারগুলোও একঘেয়ে।

কুলদীপ এবার বললো, তুমি বুঝি তোমার মা-বাবাকে অ্যাসেস করে ফেলেছো?

চেয়ারে না বসে, টেবিলের এককোণে উঠে বসে নীনা বললো, নিশ্চয়ই। প্রত্যেক ছেলেমেয়েরই উচিত, মা-বাবাকে অ্যাসেস করা। একটা বয়েস পর্যন্ত, ধরো, কুড়ি-বাইশ বছর বয়েস পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা বাবা-মায়ের গাইডেন্স পায়। তারপর ছেলেমেয়েদের খানিকটা বুদ্ধিশুদ্ধি হলে তারাও মা-বাবাকে গাইড করতে পারে। আমার বাবা-মা যদি কোনো অন্যায় কথা বলেন, আমি কি তা মেনে নেবো? মোটেই না। আমার বাবা চান না, আমি মাউন্টেইন ক্লাইমবিং-এ যাই।

—আমার বাবা-মাও আপত্তি করেছিলেন।

—কিন্তু তুমি পুরুষ, তুমি তা অগ্রাহ্য করতে পারো। আমাদের সমাজে মেয়েদের এখনো বেঁধে রাখার অনেক উপায় আছে। অবশ্য আমিও মানবো না! আমার যেটা ইচ্ছে করে, তা আমি করবোই!

—মেয়েদের ক্ষেত্রে বোধহয় অভিভাবকদের পারমিশান জরুরি।

—আমি অ্যাডাল্ট নই? আমার আবার অভিভাবক কে?

হঠাৎ ঝুঁকে এসে কুলদীপের গালটা ছুঁয়ে নীনা বললো, তুমি আমাকে সাহস দেবে, কুলদীপ।

কুলদীপের বুকটা আরও কেঁপে উঠলো। সে চাইলো সরে যেতে। নীনার সঙ্গে নিজেকে জড়াবে না আর। কিন্তু নীনার স্পর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত করা এত কঠিন!

নীনা কুলদীপের দাড়ির মধ্যে সব কটা আঙুল বোলাচ্ছে।

—এ কি করছ, নীনা?

—তোমাকে আদর করছি। সেদিন আমার অসুখের সময় তুমি কি সুন্দর ভাবে হাত বুলিয়ে আমাকে আদর করলে। তাতেই আমার অসুখ সেরে গেল।

—যাঃ, তা হয় নাকি। তুমি এত রোমান্টিক?

—তুমি বুঝি রোমান্টিক নও, কুলদীপ? রোমান্টিক না হলে কি কেউ দুর্গমকে জয় করতে যেতে পারে?

একটা মুহূর্ত দরকার। একটা সঠিক মুহূর্ত। নীনাকে কথাটা বলতেই হবে।

নীনা যেই একবার হাতটা সরিয়ে নিল, অমনি কুলদীপ বলে ফেললো, তুমি আর আমার কাছে এসো না, নীনা।

নীনা ভুরু কুঁচকে তাকালো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, কি বললে?

কুলদীপ বললো, তুমি আমার কাছে যখন তখন আসো। এটা ভালো দেখায় না। লোকে নানা কথা বলবে।

—লোকে কি বলবে, আই কেয়ার আ ড্যাম! লোকে যা খুশি বলুক!

—তবু, নীনা, শোনো

—ঠিক আছে। এবার থেকে আমরা সব সময় ঘরের মধ্যে থাকবো না। বাইরে যাবো। একদিন আমাকে পুরানো কেল্লায় নিয়ে যাবে, কুলদীপ? দিল্লিতে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে হুমায়ুনস টুম। ওই সব জায়গায় আমরা বেড়াবো।

—ওই সব জায়গায় তো তুমি দীপকের সঙ্গেই যেতে পার।

—তা তো পারিই। আমি একাও যেতে পারি না? কিন্তু বোকারাম, আমি বললাম, তোমার সঙ্গেই বেড়াবো। আমরা একসঙ্গে দেখবো।

টেবিলের কাছ থেকে সরে গেল কুলদীপ। একটা দেওয়ালের পাশে গিয়ে উল্টো দিকে ফিরে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, তা হয় না, নীনা। আর আমাদের দেখা হবে না। দেখা হবে না। দেখা হবে না।

গীতাকে যেদিন ফিরিয়ে দেয়, সেদিন কুলদীপের গলায় ছিল কঠোরতা। তখন কুলদীপ ভেবেছিল, তার জীবন শেষ হয়ে গেছে। এখন আর সেরকম মনে হয় না। এখন আর আত্মহত্যার কথাও মনে আসে না। এখন তার বাঁচার একটা জেদ এসে গেছে। তাই নীনাকে সরিয়ে দিতে গিয়ে তার বুকটা মুচড়ে যাচ্ছে। ঠেলে দেবার বদলে ইচ্ছে করছে এক্ষুনি দু হাতে জড়িয়ে ধরতে নীনাকে। অতি কষ্টে সে নিজেকে সামলাচ্ছে।

নীনা এগিয়ে এসে গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, কি হলো ?

কুলদীপ মুখ তুলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। তারপর দুবার মাথা নেড়ে বললো, এভাবে চলতে পারে না। আমি ভুল করছি।

নীনা কুলদীপের গালে নিজের কোমল গাল ছোঁয়ালো

কুলদীপ কাতরভাবে বললো, প্লিজ ! প্লিজ ! তুমি আর এসো না আমার কাছে।

নীনা সামনে ঘুরে এসে অবিশ্বাস্য সরলতার চোখে জিজ্ঞেস করলো, তোমার কি হলো বলো তো ?

—আমি স্বার্থপর হতে পারি না। আমি কারুর দয়াও সহ্য করতে পারি না।

—দয়া ? তুমি কী বলছো কুলদীপ ? বন্ধুত্বের মধ্যে দয়া কিংবা স্বার্থপরতার প্রশ্ন আসে কী করে ?

—নারী ও পুরুষের শুধু বন্ধুত্ব একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে বেশিদিন নিখাদ থাকতে পারে না !

নীনা এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে হেসে উঠলো। হাসিতে দোলাতে লাগলো মাথা। তার ছিপছিপে শরীরটি একটি ফুলগাছের মতন যেন বাতাসে দুলছে। হাসতে হাসতেই সে বললো, তুমি কি গম্ভীরভাবে কথা বলছো, কুলদীপ, এত সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছো কেন ?

কুলদীপ হাসতে পারলো না। বরং খানিকটা অপমান বোধ করলো।

তক্ষুনি তার বাড়ির বাইরে এসে থামলো একটা মোটর সাইকেল। তীব্রভাবে বেজে উঠলো হর্ন। নীনা বললো, দীপক এসে গেছে ! বাড়িতে কিছু বলে আসিনি,ঠিক এখানে খুঁজতে এসেছে। আজ আমি যাচ্ছি। একটা কথা শোনো, গম্ভীরভাবে ভুরু কুঁচকে থাকলে তোমাকে ভালো দেখায় না। তুমি যখন হাসো, তখনই বোঝা যায়, তুমি দারুণ হ্যান্ডসাম।

বাড়ির বাইরে বেরিয়ে নীনা দীপকের মোটর সাইকেলের পেছনে চাপলো। জানলা দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে কুলদীপ তক্ষুনি ঠিক করে ফেললো, এবার

থেকে নীনার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে দিতেই হবে।

কিন্তু গীতার সঙ্গে যত সহজে সম্পর্ক ছিন্ন করা গিয়েছিল, নীনার সঙ্গে তা সম্ভব হবে না। নীনা উচ্ছল স্বভাবের মেয়ে। কথায় কথায় হাসে। গম্ভীর কথার গুরুত্ব দেয় না। কুলদীপ বারণ করলেও সে আসে।

কুলদীপের কাছে এত ঘন ঘন আসায় নীনার বাবা-মাও এখন প্রকাশ্যেই বিরক্ত। তাঁরা আপত্তি জানান। নীনার বন্ধু দীপকও রাগ করে। কিন্তু নীনা জেদী মেয়ে। সে কিছু শোনে না।

কুলদীপ অফিসে গিয়ে তার বসের সঙ্গে আলোচনা করে ট্রান্সফার নিতে চায়। কানপুর, কলকাতা, দেরাদুন যেখানে হোক। সে অনুভব করে যে গীতা কিংবা মেরির চেয়েও নীনাকে অনেক বেশি ভালোবেসে ফেলেছে সে। যৌন কামনাতেও সে জ্বলছে। এই আগুনে শুধু তার বুকটাই পুড়ে খাক হয়ে যাবে। কিছুই পাবে না সে।

সারিন একদিন হাউস খাসের কাছে একটা রেস্তোরাঁয় বসে কুলদীপকে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার বলো তো, বন্ধু, বাজারে খুব গুজব যে নীনা তলোয়ার নামে একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তোমার নাকি খুব অ্যাফেয়ার চলছে?

কুলদীপ প্রথমে রেগে উঠে বললো, কে বলেছে এসব কথা? আমার সঙ্গে কোনো মেয়ে দেখা করতে আসতে পারে না? কয়েকবার দেখা করা মানেই কি অ্যাফেয়ার?

সারিন বললো, চটে যাচ্ছো কেন? লোকে তো বলবেই নানা কথা। নীনা মেয়েটি খুব ব্রাইট। মহিলা অভিযাত্রীদের টিমে চান্স পাচ্ছে। তোমার সঙ্গে তার যদি একটা সম্পর্ক হয়, সে তো ভালো কথা!

কুলদীপ উদাস গলায় বললো, সম্পর্ক? কি ধরনের সম্পর্ক? নারী পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্কের মধ্যে আমি কখনো যেতে পারবো না। আমি কোনো মেয়ের ক্ষতিও করতে চাই না।

সারিন বললো, তবু মেয়েটি তোমার কাছে এত ঘন ঘন আসে কেন? শুনেছি তার বয় ফ্রেন্ডও তোমার ওপর খুব চটে গেছে!

কুলদীপ বললো, আমি তার কি করতে পারি? আমি তাকে আসতে বারণ করেছি অনেকবার!

সারিন বললো, তুমি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছো যে তুমি তাকে বিয়ে করতে পারবে না?

কুলদীপ বললো, এটুকু বোঝার মতন বুদ্ধি তার আছে। আমি তার সঙ্গে কোনোরকম ইনভলভমেন্ট চাই না। তুমি বিশ্বাস করো।

সারিন বললো, মেয়েটি আরও আসা-যাওয়া করলে জটিলতা বাড়বে। ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দূরে সরিয়ে দেওয়াই ভালো।

কুলদীপ বললো, তুমি আমার ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করে দাও। আমি আর দিল্লি থাকতে চাই না। যেখানে খুশি পাঠিয়ে দাও।

উত্তেজিত হয়ে কুলদীপ বেশ জোরে চেঁচিয়ে উঠলো, অন্য টেবিল থেকে কয়েকজন ফিরে তাকালো। এই রেস্তোরাঁটার একটা এথনিক চরিত্র দেবার চেষ্টা হয়েছে, রাজস্থানী জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো, দেয়ালে ঝুলছে ঢাল-তলোয়ার, ফুলদানির বদলে ফুল সাজানো হয়েছে মাটির হাঁড়িতে। কাঁচ-বসানো রঙিন ঝলমলে পোশাক পরা কয়েকজন রাজপুত-রাজপুতানী গাইছে পল্লীগীতি বিদেশী টুরিস্টরা আসে এসব ভড়ং দেখতে।

সারিন কুলদীপের হাতে চাপড় মেরে হেসে বললো, এত বিচলিত হচ্ছো, তার মানেই মনে হচ্ছে ব্যাপারটা সিরিয়াস। একদিন নীনাকে এখানে ডাকবে? তা হলে ব্যাপারটা আলোচনা করা যায় ওর সঙ্গে।

কুলদীপ বললো, না।

—তুমি মেয়েটির সঙ্গে আমায় আলাপ করিয়ে দিতে চাও না?

—আমি আর জট পাকাতে চাই না। আমিই দূরে সরে যাবো।

—আমি কিন্তু মেয়েটিকে চিনি। চিনি মানে, ওকে দু-একবার দেখেছি, মেয়েদের মাকালু অভিযানের স্পন্সর আমিই জোগাড় করে দিয়েছি নীনার বাবা মিঃ তলোয়ারের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেকদিনের। তিনি মেয়েকে পাহাড়ে পাঠাতে চান না ওঁদের ধারণা, তুমিই নীনাকে ইনস্টিগেট করেছো। মিঃ তলোয়ার আমার কাছে তোমার নামে অভিযোগ জানাতে এসেছিলেন।

—ও, তুমি, তুমি ওদের পক্ষ নিয়ে আমাকে বোঝাতে এসেছো?

—কাম অন, কুলদীপ, তুমি আমাকে চেনো না? আমি ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছি সম্পর্কটা পাজলিং নয়? নীনার মতন একটা মেয়ে, খুব শার্প, ব্রাইট, অ্যাকমপ্লিশড, তার পাহাড়ের প্রতি টান আছে, সেইজন্য তোমার সম্পর্কে তার একটা হিরো-ওয়ারশিপ থাকতেই পারে। তোমার কাছে আসতে পারে গাইডেন্স নেবার জন্য। ঠিক আছে। এমনকি তোমাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্বও জন্মাতে পারে। কিন্তু সেই বন্ধুত্ব কতদূর যাবে? তার স্টেডি বয়ফ্রেন্ড আছে, মোটামুটি তার সঙ্গেই বিয়ে হবার কথা। তোমার সঙ্গে বেশি বন্ধুত্ব করতে গিয়ে

সে তার বয়ফ্রেন্ডকে চটাবে, বাবা-মাকে চটাবে ? এতখানি রিস্ক নেবে ? সে তোমার কাছে কি আশা করে ?

—আমি তার কি জানি ! সে আসে কেন ? তার বাবাকে বলো ওকে জোর করে আটকে রাখতে। আমি তাকে কোনো প্রশ্রয় দিই না। আসতেও বলি না।

—তুমি একদিন ওদের বাড়িতে গিয়েছিলে নিজে থেকে !

—হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। পরিচিত কেউ অসুস্থ হলে লোকে তাকে দেখতে যায় না ?

—কুলদীপ, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ? লেট আস বী ফ্র্যাঙ্ক। তোমার সঙ্গে ওর কোনো ফিজিক্যাল সম্পর্ক হয়েছে ? না, না, আই মীন, তোমার সঙ্গে কোনো মেয়ের বিছানার সম্পর্ক হতে পারে না, আমি জানি, তবু, আদর-টাদর, মানে, নেকিং, পেটিং....এটা তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমার মাথা গলানো উচিত নয়, তবু তোমার বন্ধু হিসেবে।

—সত্যি কথাটা শুনতে চাও ? আমি ওকে একবারও চুমু চাইনি, বুকে জড়িয়ে ধরিনি, শরীরের অন্য কোনো জায়গা স্পর্শ করিনি, শুধু দু'একদিন ওর মুখে, গালে হাত বুলিয়ে আদর করেছি। হ্যাঁ, এইটুকু সংযম আমি রাখতে পারিনি।

—ও তোমাকে অ্যালাউ করেছে ?

—তা করেছে। ও যদি প্রথমবারই আমার হাতটা সরিয়ে দিত, আমি জীবনে আর কখনো ওকে স্পর্শ করতাম না। সেটুকু আত্মসম্মানবোধ আমার এখনো আছে। ও হাত সরিয়ে দেয়নি। বরং উপভোগ করেছে। মনে হয় যেন আরও চায়। দু'একবার মুখেও বলেছে যে আমার ছোঁয়াতে ওঁর যেমন শিহরন হয়, সে রকম আর কখনো, শুধু ছোঁয়াতে... আমি শুধু কয়েকটা আঙুল দিয়ে ছুঁয়েছি ওর মুখ, আর কিছু না।

—কয়েকটা আঙুল ! কুলদীপ, তোমার ঐ কয়েকটা আঙুলের ডগায় তোমার সমস্ত মন, প্রাণ, ভালোবাসা, আকাঙ্ক্ষা, যৌনতা সব কিছু ভর করতে পারে। বিছানায় শুয়ে চরম মিলনের চেয়েও বেশি আনন্দ কখনো কখনো আঙুলের ছোঁয়ায় পাওয়া যেতে পারে। তুমি হ্যাভলক এলিসের জীবনী জানো ?

—সে কে ?

—পৃথিবী বিখ্যাত সেক্সোলজিস্ট। তুমি তার কোনো লেখা পড়োনি ?

—সেক্সোলজিস্টের লেখা আমি পড়তে যাবো ? ওসব লেখা আমার কি কাজে লাগবে ?

—ওঁর ইংরিজি চমৎকার। দারুণ কবিত্বময়। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য। সে যাই হোক, নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কের সমস্ত দিক নিয়ে যিনি বহু তত্ত্বকথা লিখেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনটা অদ্ভুত, তিনি নিজের জীবনে প্রায় মধ্য বয়েস পর্যন্ত কোনো মেয়ের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের দিকেই যাননি। বহু মেয়ে ভক্ত ছিল তাঁর, তাঁর ব্যবহার ছিল খুব মধুর, তবু কোনো মেয়েকে তিনি বিছানায় নিয়ে যাননি। শুধু দু'একটি মেয়েকে তিনি হাত বুলিয়ে আদর করতেন। উনি বলতেন, শুধু আঙুলের স্পর্শতেই যত আনন্দ পান, তার বেশি আর ওঁর দরকার হয় না। এটা বোধহয় সম্ভব, কুলদীপ। অনেক সাধু-সন্তকে দেখবে, মেয়ে-ভক্তদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেন বা আশীর্বাদ করেন। আর কিছু না, ওঁদের মনে হয়ত কোনো পাপ নেই। নিজেদের মনে করেন সংযমী, উর্ধ্বরেতা কিন্তু ঐ ছোঁয়াটুকুতেই ওদের যৌন আনন্দ পাওয়া হয়ে যায় !

—এসব থিয়োরি আমাকে শোনাচ্ছ কেন সারিন।

—তুমি বোধহয় ঐ ধরনের সাধু-সন্তের পর্যায়ে উঠে গেছো। তুমি মেয়েটিকে জাদু করেছো !

—বলডারড্যাশ ! আমি সাধু-টাধু কিছু নই। আমার কামনা-বাসনা আছে। কিন্তু আমি অক্ষম পুরুষ। তোমাদের যুদ্ধ আমাকে নপুংসক করে দিয়েছে।

—ইউ আর আ ভেরি হ্যান্ডসাম ম্যান, কুলদীপ। কথা-বার্তায়, ব্যবহারে তুমি অনেক পুরুষের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। মনের দিক থেকেও তুমি পরিপূর্ণ পুরুষ। হয়তো শরীরটা তেমন ইম্পর্টান্ট নয় সকলের কাছে। নীনা যদি খুব সেনসিটিভ মেয়ে হয়, হয়তো আঙুলের স্পর্শেও তোমার সমস্ত একাগ্রতা দিয়ে তুমি তাকে মেসমেরাইজ করেছো।

—যদি করেও থাকি সে জাদুর ঘোর কিছুদিনের মধ্যেই কেটে যাবে। আমার আর বেশি কিছু পাওয়ার নেই বলে আমি শুধু স্পর্শতেই সব কিছু পেতে পারি। কিন্তু মেয়েটি তাতে সন্তুষ্ট হবে কেন ? সে আরও কিছু চাইবে।

—সব মেয়েকে এক রকম ভেবো না ! তুমি যত গভীরভাবে ভালোবাসবে, তত গভীর ভালোবাসা ও হয়তো অন্য কোনো পুরুষের কাছে পাবে না।

—শুধু ভালোবাসার ওপর আমি আস্থা রাখতে পারি না। জাদুর মতন ভালোবাসার ঘোরও কেটে যাবে তিন মাস ছ'মাস পরে। তারপরেও যদি

কোনো মেয়ে আমার সঙ্গে থাকতে চায়, তা হলে থাকবে কর্তব্যবোধ, কিংবা আমাকে অনুগ্রহ করার জন্য। সারা জীবন আমাকে সেবা করে আত্মত্যাগের মহত্ত্ব উপভোগ করবে মনে মনে।

—অনেক পুরুষ, যাদের পুরুষাঙ্গ আছে বটে কিন্তু মনের দিক থেকে পাথর, তাদের বউরাও সারা জীবন এ রকম আত্মত্যাগ করে যায়।

—আমি সারা জীবনের জন্য কোনো নার্স রাখতে চাই না। তাহলে তো পয়সা দিয়েই রাখতে পারি।

—আমাদের এই দেশে এখনো মেয়ে কিনতে পাওয়া যায়। এমন বহু মেয়ে আছে, যারা তোমার ব্যাপারটা সব জেনেশুনেও তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে, শুধু সারা জীবন খাওয়া-পরা পাবে বলে।

—ওসব ব্যাপারে আমাকে উপদেশ দিও না, সারিন। আমি একা আছি, বেশ আছি। আমার কোনো অসুবিধে নেই। নীনার ব্যাপারে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। নীনার বাবাকে তুমি বলে দিতে পারো, তাঁর মেয়েকে আমি কোনোদিন ডাকবো না। দরকার হলে তার মুখের ওপর আমি দরজা বন্ধ করে দেবো।

—অতটা নিষ্ঠুর হতে পারবে তুমি?

—তুমি আমার এফপিজি, তোমাকে আমি লেট ডাউন করবো না।

—এফপিজি?

—ওঃ হো, ওটা আমাদের আর্মি কোড। গুরুজীর মতন, এফপিজি। ফ্রেন্ড-ফিলোজফার অ্যান্ড গাইড!

সারিন হো-হো করে হেসে উঠলো।

কুলদীপ বললো, তুমি আমার ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করে দাও। কলকাতায় পাঠাতে পারো। কিংবা সিমলা-নৈনিতালের দিকে কিছু নেই?

সারিন বললো, তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, কুলদীপ? একজন দায়িত্ববান ভদ্রলোক হিসেবে নিশ্চয়ই আমি চাইবো যে নীনা তোমার জীবন থেকে সরে যাক। আর কোনো গণ্ডগোল, ঝামেলা না হওয়াই ভালো। কিন্তু আর একটা কথাও মনে হচ্ছে। তুমি বললে, নীনার জাদুর ঘোর কয়েক মাসের মধ্যেই কেটে যাবে। কিন্তু নীনার মতন একটা দারুণ প্রাণবন্ত মেয়ের সঙ্গে কয়েকটা মাসও জাদুর ঘোরের মধ্যে থাকা কি খুবই রোমাঞ্চকর নয়? সেই কয়েকটা মাসের আনন্দই তো সারা জীবনের সম্বল হতে পারে!

কুলদীপ ঝুঁকে এসে বললো, তুমি জানো না সারিন, আমি আসলে কত

দুর্বল। এসব কথা বলে আমাকে আরও দুর্বল করে দিও না!

॥ ১২ ॥

পরদিন সকালেই এলো নীনা।

সে কোনোদিন শাড়ি, কোনোদিন শালোয়ার-কামিজ, কোনোদিন জিন্‌স পরে। আজ পরে এসেছে একটা গাঢ় নীল রঙের কাফতান। মাথার চুল খোলা। সে যেন সঙ্গে করে একটা দমকা হাওয়া নিয়ে আসে।

প্রথমে সে কয়েক মিনিট গল্প করে শের সিং-এর সঙ্গে। রান্না ঘরে উঁকি মারে। রান্না করা খাবার থেকে একটুখানি তুলে নিয়ে মুখে দেয়। এই ফ্ল্যাটের সর্বত্র তার সাবলীল বিচরণ।

কোথা থেকে সে একটা অক্সিজেনের বোতল জোগাড় করেছে। সেটা হাতে নিয়ে গুনগুনিয়ে কিছু একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ঢুকলো কুলদীপের ঘরে।

নীনার আগমনের ধ্বনি শুনেই কুলদীপ গম্ভীরভাবে কাজে মন দিল। নীনা ঘরের মধ্যে চলে আসার পরেও সে মুখ তুলে তাকালো না।

কুলদীপের কাছে এসে বললো, আমার একটা প্রশ্ন আছে। কুলদীপ তার টাইপ রাইটারে খটাখট করতে লাগলো। নীনাকে সে গ্রাহ্য করতে চায় না।

নীনা বসলো, একটা সিলিন্ডার থেকে এই বোতলে অক্সিজেন আসে, তাই তো? সিলিন্ডারে একটা রেগুলেটর থাকে, তা দিয়ে এই বোতলের অক্সিজেনের প্রেসার কন্ট্রোল করা যায়। কিন্তু রেগুলেটরটা যদি লীক করে? তা হলে তো বোতলের প্রেসার কমে যাবে! আমি শুনেছি, রেগুলেটরে এ রকম গোলমাল হয়। খুব হাই অলটিটিউডে এরকম গোলমাল হলে কী কী করতে হবে?

কুলদীপ মুখ তুলে নীরস গলায় বললো, এসব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? তুমি যেখানে ট্রেইনিং নিচ্ছো, সেখানেই এসব বলে দেবে!

নীনা তবু আদুরে গলায় বললো, না, প্লিজ, তুমি বলো। আমি তোমার কাছ থেকেই এসব শিখতে চাই!

কুলদীপ দৃঢ় গলায় বললো, প্লিজ, এসব নিয়ে আমায় বিরক্ত কোরো না। আমার সঙ্গে পাহাড়ের আর কোনো সম্পর্ক নেই!

নীনা তবু হাসতে হাসতে বললো, পাহাড়ের ওপর বুঝি তোমার অভিমান হয়েছে? একজন অভিযাত্রী পাহাড়কে ছাড়তে চাইলেও পাহাড় কখনো

অভিযাত্রীকে ছাড়ে না। কুলদীপ আমি যখন অভিযানে যাবো, আমি চাই তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে। আমি কবে কত ফিট উঁচুতে উঠছি, এটা কল্পনা করে তুমি ভাইকেরিয়াস প্লেজার পাবে, আমিও ভাববো, তুমি দূর থেকে আমার দিকে চেয়ে আছো।

কুলদীপ বললো, আই উইশ ইউ সাকসেস। এখন আমি নিজের কাজ নিয়ে কিছুদিন খুব ব্যস্ত থাকবো।

নীনা বললো, বেশি কাজ দেখিও না। মনে করো, টেবিলের এই ধারটা Razor's Edge. আমি এখান দিয়ে পীকের দিকে উঠছি। এমন সময় দেখলুম যে রেগুলেটর লীক করছে, বোতলের অক্সিজেনের প্রেসার কমে যাচ্ছে। তখন কী করতে হবে?

কুলদীপ বললো, রেগুলেটর পাল্টে ফেলতে হবে। সে জন্য দু'তিনটে এক্সট্রা রেগুলেটর সঙ্গে রাখতে হয়!

নীনা বললো, যদি না থাকে?

কুলদীপ বললো, তা হলে আর উঠতে পারবে না। নেমে যেতে হবে!

নীনা কুলদীপের কাঁধে হাত রেখে বললো, কি হচ্ছে কুলদীপ, আমার সঙ্গে এমন কাঠ-কাঠভাবে কথা বলছো কেন?

কুলদীপ গম্ভীরভাবে বললো, তুমি যা জানতে এসেছিলে তা তো বলে দিলাম! তোমার দরকার মিটে গেছে, এখন আমাকে কাজ করতে দাও!

—আমি বুঝি তোমার কাছে শুধু দরকারের জন্য আসি!

—তবে কেন আসো?

—তুমি তা বুঝতে পারো না?

—না, পারি না। আমার কাছে তোমার কিছুই পাবার নেই।

—আমি কিছু পেতেও চাই না। আমি আসি ভালোবাসার টানে।

কুলদীপ এবার প্রায় ধমকের সুরে বললো, ভালোবাসা কি শুধু একটা কথার কথা? যে ভালোবাসার কোনো ফুলফিলমেন্ট নেই, তা কিছুদিনের মধ্যেই মিলিয়ে যায়। তুমি জানো, তোমাকে সে রকম কিছুই আমি দিতে পারবো না।

এবার নীনাও ধমকের সুরে বললো, তুমি বার বার এই কথা বলো কেন, কুলদীপ? পেনিস আর ক্লিটোরিসের ব্যবহার ছাড়া বুঝি ভালোবাসার ফুলফিলমেন্ট হয় না? আমি তা মনে করি না। আমার মতে ভালোবাসার সম্পর্ক অনেক গভীর।

কুলদীপ একটুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলো। কোনো মেয়ের মুখ থেকে এরকম শব্দ শুনবে সে আশাই করেনি।

নীনা আবার বললো, সত্যিকারের ভালোবাসার উপলব্ধি হলে সামান্য একটু চোখের চাওয়ায়, সামান্য স্পর্শেই যে আনন্দ পাওয়া যায়.....

তাকে বাধা দিয়ে কুলদীপ বললো, কতদিন ? কতদিন শুধু ঐটুকু আনন্দ পেয়ে--

নীনা বললো, আমি জীবন নিয়ে কোনো অঙ্ক কষি না।

কুলদীপ এবার কণ্ঠস্বর নরম করে বললো, আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না, নীনা। আমি তোমাকে অ্যাডম্যায়ার করি। তোমার সামনে চমৎকার ভবিষ্যৎ পড়ে আছে। কিন্তু আমি তোমার যোগ্য নই। তুমি কাছাকাছি এলে আমি চঞ্চল হয়ে উঠি। আমার মাথার ঠিক থাকে না। আমি কোনো কাজে মন বসাতে পারি না আমাকে এবার শান্তভাবে কাজকর্ম করতে দাও।

নীনা গাঢ় স্বরে বললো, তুমি সত্যি চাও আমি দূরে সরে যাই ?

কুলদীপ বললো, হ্যাঁ। আমি সত্যিই তা চাই।

নীনা তবু কাছে এসে ব্যাকুলভাবে বললো, কেন, এমন করছো, কুলদীপ ? আমি তোমার বন্ধুত্ব চাই, চাই, চাই, চাই ! কেন আমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছো ?

কুলদীপ অবিচলিত গলায় বললো, আমাদের দূরে সরে যেতেই হবে। নইলে আমরা দু'জনেই কষ্ট পাবো ! গুড বাই, নীনা !

নীনা অক্সিজেনের বোতলটা তুলে নিল। দরজার কাছ পর্যন্ত চলে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে হাসি-কান্না মেশানো গলায় বললো, তুমি আমাকে ডাকবে না, কুলদীপ ? আমি ভেবেছিলাম, তুমি এক্ষুনি বলবে, নীনা, যেও না !

কুলদীপ আবার বললো, গুড বাই, নীনা !

নীনা ফিরে এসে হাতের ঝটকায় ফেলে দিল টেবিলের সব কাগজপত্র। মুখখানা তার রাগে গনগনে হয়ে গেছে। কুলদীপের মাথার পাগড়ি খুলে ফেলে তার চুল চেপে ধরে বলতে লাগলো, তুমি আজকাল আমি এলেই চলে যেতে বলো। আমাকে দূর দূর করো ! আমি কি একটা ভিখিরি ? আমার কোনো দাম নেই তোমার কাছে ? তুমি কি একটা পাথর ?

কুলদীপ একটা পাথরের মতনই অনড়, নীরব হয়ে রইলো।

নীনা বললো, ঠিক আছে আর আসবো না আসবো না। কোনোদিন আর তোমার মুখ দেখবো না !

নীনা এবার এক ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কুলদীপ দু' হাতে মুখ ঢাকলো।

একটু পরে কুলদীপ জানলার কাছে এসে বন্ধ করে দিল রাস্তার দিকের জানালা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলো, শেষ পর্যন্ত সে কঠিন থাকতে পেরেছে। নীনার সামনে কোনো দুর্বলতা দেখায়নি। তার জীবন থেকে নীনার পর্বও শেষ হয়ে গেল। এরপর থেকে সে একা, আবার সে পাহাড়ের খাদে পড়ে যাওয়া মানুষের মত একা।

ঘরের মধ্যে এখনো নীনার শরীরের ঘ্রাণ রয়ে গেছে।

নীনা আর এলো না। তার বন্ধু দীপকের সঙ্গে সে মোটর সাইকেল চেপে বেড়াতে যায়, কিন্তু কুলদীপের বাড়ির সামনের রাস্তাটা দিয়ে যায় না।

নীনার বন্ধুটি খুবই সুপুরুষ কিন্তু তার স্বভাবে কোনো গভীরতা নেই। সে পার্টি, হৈ-হল্লা, রেস্তোরাঁয় খাওয়া এবং প্রকাশ্যে প্রেম করা পছন্দ করে। নীনাও আগে এই সবই পছন্দ করতো। কিন্তু এখন কোনো পার্টিতে গিয়ে তার আর নাচতে ইচ্ছে করে না। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে হঠাৎ সে চুপ করে যায়। অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকে।

একদিন দীপক মোটর সাইকেলের বদলে নতুন একটা গাড়ি নিয়ে এলো। ঝকঝকে রুপোলি রঙের কিয়াট। গাড়িটা দেখে নীনা খুব খুশি হয়ে বললো, বাঃ, কি সুন্দর!

দীপক বললো,তোমাকে সারপ্রাইজ দেবো বলে আগে বলিনি। আজই ডেলিভারি পেয়েছি। চলো, একটা লং ড্রাইভে যাই।

নীনা উৎসাহের সঙ্গে রাজি হলো। তৈরি হয়ে এলো একটুক্ষণের মধ্যেই।

বিকেল চারটে হলেও আজ রোদ নরম। আকাশ মেঘলা মেঘলা। বেড়াতে যাবারই দিন। দিল্লি শহর থেকে একটু বেরুলেই অনেক বেড়াবার জায়গা।

দীপক বেশ জোরে গাড়ি চালায়। শহর ছাড়িয়ে গাড়ি ছুটছে ফাঁকা রাস্তায়। আকাশটা এবার লাল হয়ে এসেছে। ঝড় উঠছে একটু একটু।

বড় রাস্তাটা ছেড়ে গাড়িটা বাঁক নিল একটা মাঝারি রাস্তায়। দূরে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা ছোট ছোট টিলা।

নীনা জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাচ্ছো এদিকে?

দীপক বললো, চলোই না। এদিকে একটা সুন্দর জায়গা আছে। তোমার বাড়ি ফেরবার তাড়া নেই তো!

নীনা দু'দিকে মাথা নাড়লো।

রাস্তার দু'দিকে কয়েকটা ছড়ানো ঘর বাড়ি। একটা গ্রামের মতন। হঠাৎ রাস্তার এক পাশ থেকে একটা বাচ্চা ছেলের হাত ধরে, মাথায় একটা ঝুড়ি নিয়ে একজন স্ত্রীলোক চলে এলো মাঝখানে। এত জোরে গাড়ি চালাচ্ছে দীপক যে হঠাৎ ব্রেক কষলে গাড়ি উল্টে যাবে। তবু সে ব্রেকে পা চেপে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে স্ত্রীলোকটি ও বাচ্চাটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করলো। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো নীনা।

দারুণ কৃতিত্বের সঙ্গে দীপক স্ত্রীলোকটির একেবারে গা ঘেঁষে গিয়ে একটু দূরে গাড়িটা থামিয়ে ফেললো। বাচ্চাটা ও স্ত্রীলোকটি আর্ত চিৎকার করে উঠেছে, বাচ্চাটা এক লাফ দিয়ে সরে গেছে দূরে ঠিক সময়ে। স্ত্রীলোকটি আছড়ে পড়েছে মাঝ রাস্তায়, তার ঝুড়িটায় ভর্তি ছিল ডিম, তার অনেকগুলি ভেঙে গেছে, আর কিছু গড়াচ্ছে।

দীপক জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দাঁত কিড়মিড় করে বললো, হারামজাদী, চোখে দেখতে পাস না?

নীনা বিহ্বল গলায় বললো, লেগেছে? কেউ মারা গেছে?

দীপক বললো, কিচ্ছু হয়নি, দুটোই বেঁচে গেছে।

নীনা দরজা খুলে নামতে যাচ্ছিল, তার আগেই দীপক আবার গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে।

নীনা বললো, দাঁড়াও! ওদের কি হলো দেখি!

দীপক বললো, মাথা খারাপ নাকি? এক্ষুনি গ্রামের লোক ছুটে আসবে। ধরতে পারলে আমাদের ধোলাই দেবে। এখানে কেউ দাঁড়ায়!

নীনাকে নামবার সুযোগ দিল না, দীপক আবার হুস করে বেরিয়ে গেল। নীনার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে।

দুটো টিলার মাঝখান দিয়ে চলে গেল গাড়িটা। পেছনের গ্রামটা আর দেখা গেল না। খানিক পরেই একটা নদী। জায়গাটা বেশ নির্জন। এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে কিছু গাছপালা। আকাশ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে শেষ বিকেলের রং।

গাড়িটা থামিয়ে দীপক জিজ্ঞেস করলো, জায়গাটা সুন্দর না?

নীনা মাথা নাড়লো।

তারপর গাড়ি থেকে নেমে, নদীর দিকে চেয়ে নীনা বললো, ঐ মেয়েটার অতগুলো ডিম ভেঙে গেল, কত ক্ষতি হলো।

দীপক ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, ওরই তো দোষ! হঠাৎ ঐভাবে রাস্তা পার হতে

গেল কেন ? ওকে বাঁচাতে গিয়ে আর একটু হলে আমাদেরই সাংঘাতিক অ্যাকসিডেন্ট হতো।

নীনা বললো, ওর বাকি ডিমগুলো কুড়োতে আমরা কি একটু সাহায্য করতে পারতাম না ?

দীপক বললো, তুমি এখনো ওর কথা ভাবছো ? ওকে একটা একশো টাকার নোট দিলেই চুকে যেত। তা দিতে আমার কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু তুমি তো গ্রামের মানুষগুলোকে চেনো না। সে শালারা এসেই আমাদের পেটাতে শুরু করে দিত। গাড়িটা ড্যামেজ করে দিত। ওখানে দাঁড়ানো যায় না ! ফরগেট অ্যাবাউট দা হোল থিং। আমরা ফেরার সময় অন্য রাস্তা দিয়ে যাবো !

নদীর ধার দিয়ে ওরা হাঁটতে লাগলো পাশাপাশি।

এক জায়গায় কতকগুলো বড় বড় পাথর। মনোরম বসার জায়গা। অনেকেই এখানে আসে। পাথরগুলোর গায়ে খড়ি ও কাঠকয়লা দিয়ে প্রেমিক প্রেমিকাদের নাম লেখা।

দীপক নীনার কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে সামনের দিকে টেনে এনে একটা চুম্বন দিতে গেল।

নীনা মুখটা সরিয়ে নিয়ে বললো, আমি একটা মেয়ে তুমি আমার সামনে অন্য একটা মেয়েকে হারামজাদী বললে কেন ?

দীপক খানিকটা অসহিষ্ণুভাবে বললো, আরে ওরা তো...

তারপর কথা ঘুরিয়ে বললো, ঐ সময় কি মেজাজ ঠিক থাকে ? আমি তো ভেবেছিলাম স্টিয়ারিং-এর ওপর কন্ট্রোল থাকবে না। গাড়িটা ক্র্যাশ করবে একটা গাছের সঙ্গে ! তোমার যদি কোনো চোট লাগতো ?

নীনা বললো, বাচ্চা ছেলেটা ভয়ে কেঁদে ফেলেছিল। আমরা তার সঙ্গে একটাও কথা না বলে চলে এলাম।

দীপক বললো, তুমি বুঝতে পারছো না কেন, ওখানে থামা যায় না ! এটা তোমার বাজে সেন্টিমেনট। শেষ পর্যন্ত তো ওদের কোনো চোট লাগেনি। আমি যে ওদের বাঁচিয়ে দিলাম, সে জন্য আমাকে কোনো ক্রেডিট দেবে না ?

ওরা এবার বসলো একটা পাথরের আড়ালে। দীপক নীনার কাঁধে হাত রাখলো।

নীনা বললো, আর দু সপ্তাহ বাদে আমি সিমলায় মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং ক্যাম্পে চলে যাবো তারপর অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে না

দীপক বললো, তোমাকে ওখানে যেতে হবে না। চলো, আমরা একসঙ্গে কাশ্মীর বেড়াতে যাবো। সেখানে অনেক পাহাড় পাবো।

নীনা অদ্ভুতভাবে হাসলো।

দীপক বললো, আমি অবশ্য পাহাড়ের চেয়ে সমুদ্র বেশি ভালোবাসি। আমরা কোভালম বীচ-এও যেতে পারি।

কথা বলতে বলতে দীপক নীনার গালে হাত বুলোতে লাগলো। তারপর আরও আদর করার জন্য তাকে টানলো কাছে।

নীনা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শান্ত গলায় বললো, ও রকম কোরো না।

দীপক খানিকটা অবাক হয়ে বললো, কি হলো ?

—কিছু হয়নি, এমনিই, ভালো লাগছে না !

—তুমি হঠাৎ অফ্ মুড হয়ে গেলে কেন ? নীনা, এসো, আমরা আজ একটা প্ল্যান করে ফেলি। আমি যে অ্যাপার্টমেন্টটা কিনেছি, সেটা আগে ভালো করে সাজাতে হবে।

—এখন ওসব কথা ভাবতে আমার ইচ্ছে করছে না। তোমার হাতটা সরিয়ে নাও, প্লিজ। ওরকমভাবে আমাকে টানাটানি কোরো না !

—তোমার কি হয়েছে, আমাকে বলতেই হবে !

—আমি যদি তোমার ইচ্ছেতে এখন রাজি না হই, তাহলে তুমি কি আমাকেও হারামজাদী বলবে।

দীপক এমনই আহত হলো যে কোনো কথা খুঁজে পেল না। নীনা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল গাড়ির কাছে। ফেরার পথে সারা রাস্তা ওরা এলো প্রায় নিঃশব্দে।

এরপর তিন দিন নীনা আর বাড়ি থেকে বেরোলোই না।

দীপক দেখা করতে এলে ফিরিয়ে দেয়। সে টেলিফোন করলেও ধরে না। তিনতলায় নিজের ঘরে চুপচাপ বসে কাটায়। নীনার বাবা-মা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা কিছু বোঝাতে এলে খিটিমিটি লেগে যায়।

নীনার বাবা হঠাৎ একদিন বললেন যে, তাঁরা সবাই বম্বে যাচ্ছেন, নীনাকেও যেতে হবে !

নীনা বললো, আমি বম্বে যাবো কেন ? আমার তো বম্বেতে কোনো দরকার নেই।

বাবা বললেন, তোমার মা, ছোট দুই ভাই-বোন, সবাই যাচ্ছে। তুমি একা একা এ বাড়িতে থাকবে কি করে ?

নীনা বললো, আমি কি কচি খুকি নাকি ? এর আগে আমি একলা থাকিনি ? আমার এখন কোনো ইচ্ছে নেই বম্বে যাবার।

নীনার মা বললেন, বেটি, এখানে একলা থাকলেই তুই আবার ঐ কুলদীপ সিং-এর কাছে যাওয়া আসা শুরু করবি। একটা লোক সারাজীবনের মতন পঙ্গু হয়ে গেছে, তার কাছে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তোর বসে থাকা, এটা একটা মরবিডিটির লক্ষণ। তুই এরকম করছিস বলে আমাদের সমাজে একটা বদনাম হয়ে যাচ্ছে।

নীনা রাগে দপ করে জ্বলে উঠে বললো, তোমরা ওর কথা আর আমার সামনে কক্ষনো উচ্চারণ করবে না।

মা-বাবার সামনে থেকে উঠে গিয়ে নীনা নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

কুলদীপ আজকাল অনেক রাত জেগে লেখে। অফিস থেকে ফিরেই সে টাইপ করতে বসে। লেখার মধ্যে মগ্ন থেকে অন্য সব কিছু ভুলে থাকতে চায়। দু পাতা টাইপ করে, তারপর পড়তে গিয়ে তার পছন্দ হয় না, ছিঁড়ে ফেলে আবার।

রাত একটা বেজে গেছে, কুলদীপ তখনো খটাখট শব্দে এক মনে টাইপ করে যাচ্ছে। এমন সময় দরজার বাইরে থেকে শের সিং আড়ষ্ট গলায় ডাকলো, সাব ! সাব !

কুলদীপ বললো, তুই জেগে আছিস কেন ? তুই শুতে যা। আমার দেরি হবে।

শের সিং আবার ডাকলো, সাব ! ইধার দেখিয়ে !

কুলদীপ পেছন ফিরে তাকালো। চমকে উঠলো।

শের সিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে আছে নীনা। তার সর্বাঙ্গ ভেজা। কাঁধে একটা ব্যাগ।

কুলদীপ বললো, এ কি ? তুমি ?

নীনা বললো, কুলদীপ, আমি তোমার কাছে চলে এসেছি। তুমি এখনো আমাকে ফিরিয়ে দেবে ?

কুলদীপ বললো, এসো, এসো। ভেতরে এসো। একেবারে ভিজে গেছ...এই শের সিং। একটা শুকনো তোয়ালে নিয়ে আয়।

নীনা বললো, আমাকে দেখে তুমি রাগ করোনি ?

কুলদীপ বললো, তুমি চলে এসেছো মানে কী ? কোথা থেকে চলে এসেছো ?

নীনা বললো, নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। আর ফিরে যাবো না। বাবা-মা আমার ওপর অন্যায় জোর করছিল। আমি কোনোরকম অধীনতা মানতে রাজি নই। আমি ইচ্ছে করলে যে-কোনো জায়গায় একলাও থাকতে পারি। তুমি আমাকে দেখে রাগ করলে আমি এক্ষুনি চলে যাবো।

কুলদীপ বসে আছে টেবিলের সামনে হুইল চেয়ারে। নীনা তখনো দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে, তার সর্বাঙ্গ দিয়ে টপ টপ করে ঝরে পড়ছে জলের ফোঁটা।

চেয়ারটা আস্তে আস্তে ঘোরালো কুলদীপ। একটুক্ষণ অপলক নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো ভিজে শাড়ি পরা নারীটির দিকে। বৃষ্টিময় আকাশ থেকে যেন নেমে এসেছে এক পরী।

কুলদীপ হঠাৎ আর্ত চিৎকারের মতন ডেকে উঠল, নীনা !

নীনা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার বুকে। কুলদীপ দুহাতে তার মুখখানা তুলতেই নীনা চুম্বনে চুম্বনে তাকে অস্থির করে দিল। আর পাগলের মতন বলতে লাগলো, কুলদীপ, কুলদীপ, তুমি কেন আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে ? তুমি বোঝো না, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না ? আমি চেষ্টা করেছিলাম, ভেবেছিলাম, তোমার কাছে আর আসবো না, তুমি আমাকে চাও না।

কুলদীপ বললো, তুমি সেদিন চলে যাবার পর আমি প্রতিটি মুহূর্ত শুধু তোমার কথাই ভেবেছি। আমার আর কোনো কাজে মন নেই। তুমি চলে যাবার পর আমার জীবন থেকে যেন বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যটাই চলে গিয়েছিল !

নীনা বললো, আমাকে শক্ত করে ধরো, কুলদীপ। আমাকে তোমার বুকে রাখো। আর কোথাও যেতে দিও না।

কুলদীপ বললো, আমি তোমাকে সম্পূর্ণ করে পেতে চাই। কিন্তু আমার যে ধরে রাখার ক্ষমতা নেই !

নীনা বললো, তোমার এই চওড়া বুকখানায় কত বড় জায়গা।

কুলদীপ চরম তৃষ্ণার্তের মতন আবার নীনার ঠোঁটে চেপে ধরল তার ঠোঁট !

তার বাসনা যেন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আজকের এই কয়েকটা মুহূর্তের জন্য জীবনের আর সব কিছু তুচ্ছ করা যায়। এ যেন শুধু কোনো

নারীকে পাওয়া নয়, এ যেন দুটি প্রাণের নিবিড় যোগাযোগ। আত্মবিশ্বাসের পুনরুদ্ধার।

দরজার কাছে শের সিং একটা তোয়ালে নিয়ে এসে আবার তাড়াতাড়ি সরে গেল। কুলদীপ এবার সামলে নিল খানিকটা।

নীনাকে বুক থেকে তুলে বললো, ঐ চেয়ারটায় বসো। কি হলো, সব শুনি।

নীনা বললো, আমি এমনভাবে চলে এসেছি বলে তুমি সত্যি আমার ওপর রাগ করোনি ?

নীনার একটা হাত ধরে নিজের গালে ছুঁইয়ে রেখে কুলদীপ বললো, রাগ করবো কেন ? তোমার চেয়ে মূল্যবান যে পৃথিবীতে আমার আর কিছুই নেই। কিন্তু নীনা, শুধু আমাকে নিয়ে তুমি থাকবে কি করে ? আমি যে তোমাকে অনেক কিছুই দিতে পারবো না।

নীনা বললো, তোমার কিছুই দিতে হবে না। আমি তোমাকে দেবো। আমার অনেক কিছু দেবার আছে, তুমি নিতে চাও কি না বলো !

কুলদীপ বললো, পাগল মেয়ে আর কাকে বলে ! হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে আসতে হলো কেন, বলো !

শের সিং আবার তোয়ালে নিয়ে এলো নীনা মাথাটা মুছতে মুছতে বললো, বিশেষ কিছু হয়নি। আমার বাবা-মায়ের সঙ্গে মতে মিলছিল না, তাই আমি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। প্রথমে তোমার কাছে আসবার কথাই মনে হলো।

—কাল সকালে তোমার বাবা-মা তোমাকে দেখতে না পেয়ে এখানে নিশ্চয়ই খোঁজ নিতে আসবেন।

—তা আসবেন বোধহয়। কিন্তু আমি যথেষ্ট অ্যাডাল্ট। আমি যাবো না। আমাকে জোর করে নিয়ে যেতে পারবে না।

—আর তোমার সেই বয়ফ্রেন্ড !

—তার সঙ্গে আমি সম্পর্ক ঘুচিয়ে ফেলেছি।

—কিন্তু সে ভাববে, আমিই যত নষ্টের গোড়া। সেও যদি এখানে হামলা করতে আসে, এতজনের সঙ্গে তো আমি লড়াই করতে পারবো না।

—তোমায় কিছু করতে হবে না। যা বলার আমিই সব বলবো। আচ্ছা কুলদীপ আমরা এখান থেকে চলে যেতে পারি না ? অনেক দূরে, যেখানে কেউ আমাদের বিরক্ত করবে না, কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না !

—এরকম একটা রোমান্টিক প্রস্তাব শুনলে যে-কোনো যুবকের লাফিয়ে ওঠা উচিত। দেড় বছর আগে শুনলে আমিও হয়তো লাফিয়ে উঠতাম। কিন্তু নীনা, এখন যে আমার লাফাবার ক্ষমতাই নেই।

—ও কথা বোলো না, কুলদীপ। তোমার ক্ষমতা অনেক বেশি। তোমার মতন এমনভাবে আমাকে তো আর কেউ টানেনি!

একটুক্ষণ চিন্তা করে কুলদীপ বললো, কাল সকালে তোমার বাড়ির লোক আর তোমার প্রাক্তন বন্ধু যদি এখানে এসে একটা হাঙ্গামা বাধায়, সেটা খুব বিশ্রী ব্যাপার হবে। আমি ও সবের মুখোমুখি হতে চাই না। সকালের আগে অন্য কোথাও চলে যাওয়া দরকার। তোমার ব্যাগে কী আছে, নীনা!

নীনা বললো, শুধু দু সেট শাড়ি-ব্লাউজের চেইঞ্জ। বাপের বাড়ি থেকে আমি কোনো গয়না-গাঁটি বা টাকাকড়ি কিছু আনিনি। নিজের চেক বইটা অবশ্য সঙ্গে আছে। আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আছে সামান্য কিছু টাকা।

কুলদীপ বললো, খুব ভালো করেছো। গয়না বা টাকা-পয়সা সঙ্গে আনলে আবার নাক গলাতো পুলিশ। তা হলে চলো।

শের সিংকে ডেকে বললো, কেউ খোঁজ করলে বলবি, আমি কোথায় গেছি, তুই জানিস না। সত্যি তোকে জানাচ্ছিও না এখন। পরে খবর দেবো। এখন চুপি চুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমাদের ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ডেকে আনতে পারবি?

সদর দরজার কাছে দুজন অপেক্ষা করতে লাগলো অধীরভাবে।

কুলদীপ বললো, আমার বন্ধু সারিন বলেছিল স্পেশাল ডিজাইনের একটা ভক্সহল গাড়ি কিনতে। সেটা এতদিনে কিনলে এখন আমি নিজেই চালিয়ে তোমাকে নিয়ে যেতে পারতাম। অনেক দূরে, নিরুদ্দেশে।

নীনা বললো, সে রকম গাড়ি একটা আমাদের কিনতেই হবে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার গাব্বু মানালা এসে খুব উৎসাহের সঙ্গে দরজা খুলে দিয়ে বললো, আসুন সিংজী। নীনার দিকে সে আড়চোখে একবার তাকালো। এত রাতে যে একটা নাটক ঘটতে চলেছে, তা বুঝেছে সে।

বাইরে তখনো অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। ট্যাক্সিতে উঠতে গিয়ে কুলদীপও একটু ভিজে গেল।

গাব্বু জিজ্ঞেস করলো, কোন দিকে চলবো, সিংজী?

ঝোঁকের মাথায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেও কুলদীপ এখনো ঠিক করতে পারেনি, কোথায় যাওয়া যায়। কোনো হোটেলে উঠতে গেলে জানাজানি হয়ে

যেতে পারে। এই বিচিত্র কাপল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। ট্যাক্সি চেপে কেউ নিরুদ্দেশে যায় না। একটাই মুখ মনে পড়লো কুলদীপের।

সে বললো, গাব্বু, চাণক্যপুরীর দিকে চলো।

এত রাত্রে ডেকে তোলা হলেও সারিন খুব বিস্মিত হলো না। তাদের বাড়িটা দোতলা, নীচের তলায় বসবার ঘর। ভিজে শাড়ি পরা নীনাকে নিজের স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে কুলদীপকে আনলো বসবার ঘরে। পাঁচখানা সিঁড়ি ও উঁচু চৌকাঠ পেরিয়ে বসবার ঘরে আসতে হয়, কুলদীপের নিজে ওঠার সাধ্য নেই, গাব্বু আর সারিন চেয়ারটা ধরে তুললো। দেড় বছর আগে কুলদীপ একটা লাফ দিয়েই এইটুকু উঠতে পারতো।

গাব্বু বললো, আমি ট্যাক্সিতে অপেক্ষা করছি, স্যার?

কুলদীপ বললো, আর লাগবে না, গাব্বু। তুমি ফিরে যাও। তোমার কাছে আমি কি যে কৃতজ্ঞ!

গাব্বু চলে যাবার পর সারিন বললো, এভারেস্টজয়ী মেজর কুলদীপ সিং-এর আর একটি রোমহর্ষক অভিযান! মধ্যরাত্রে এক সুন্দরী তরুণীকে নিয়ে পলায়ন!

কুলদীপ লজ্জা পেয়ে বললো, কথা রাখতে পারলাম না, এফপিজি! নীনাকে আমি দূরে সরিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করেছি। তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছি। তবু যদি সে সব কিছু ছেড়ে আমার কাছে ছুটে আসে, তাকে আমি ফেরাবো কী করে?

সারিন বললো, তা তো বুঝলাম। কিন্তু এত বড় একটা ঝুঁকি নিয়ে ফেললে পরে সামলাতে পারবে? নীনার বাবা খুব ইনফ্লুয়েনশিয়াল লোক। টাকা-পয়সার জোর আছে। সে তো সহজে ছাড়বে না।

কুলদীপ বললে, সারিন, অন্য বাধা আমি গ্রাহ্য করি না। আসল বাধা ছিল আমার মনে। কিন্তু নীনা একটা ঝড়ের মতন এসে আমার সব যুক্তি-বুদ্ধি এলোমেলো করে দিয়েছে। নীনার ইচ্ছেটাই সবচেয়ে বড় কথা।

সারিন বললো, মেয়েটা তোমাকে পাগলের মতন ভালোবেসে ফেলেছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, কতখানি ভালোবাসা আর কতখানি অন্ধ মোহ?

কুলদীপ বললো, এখন কি সেটা বিচার করার সময়? তুমি সেদিন কী বলেছিলে মনে নেই? যদি অন্ধ মোহও হয়, যদি ছ মাস পরে ওর ঘোর কেটেও যায়, তবু এই ছ মাসই হবে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়।

সারিন বললো, লাকি ডগ! তোমাকে আমার হিংসে হচ্ছে, কুলদীপ। ঠিক

আছে, এখন কি করতে চাও ?

কুলদীপ বললো, নীনা আর আমার, দুজনেরই ইচ্ছে, দিল্লি থেকে দূরে কোথাও চলে যাওয়ার। নীনা অ্যাডাল্ট, ওর নামে কোনো পুলিশ কেস হতে পারে না। কিন্তু ওর বাবা-মা ঝঞ্ঝাটি পাকাবার চেষ্টা করলেও এক্ষুনি তাঁদের ফেস করতে চাই না। তুমি একটা ব্যবস্থা করে দাও, সারিন, কালকেই যদি কোথাও যাওয়া যায়।

একটুক্ষণ চিন্তা করে সারিন বললো, ঠিক আছে, লাদাখ চলে যাও। ওখানে আমাদের কমন ফ্রেন্ড রাওয়াত আছে। সে থাকার জায়গা ঠিক করে দেবে। আপাতত আমি তোমার অফিস থেকে দু মাসের ছুটি করিয়ে দিচ্ছি।

তারপর সে হেসে উঠে বললো, তুমি সত্যিই আবার একটা বিশ্ব রেকর্ড করলে, কুলদীপ। দুপায়ে হাঁটার ক্ষমতা নেই, এমন কোনো লোক এর আগে পৃথিবীতে আর কোথাও একটা মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে কি ?

সারিনের স্ত্রী প্রভা নীনাকে সঙ্গে নিয়ে এলো এ ঘরে। ভিজে পোশাক বদলে নীনাকে একটা দামি শাড়ি পরানো হয়েছে। সাজগোজও করানো হয়েছে খানিকটা। নীনার মুখে নববধূর মতন ব্রীড়া।

প্রভা বললো, এ কী সাঙ্ঘাতিক মেয়ে গো ! এত রাত্তিরে বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে হেঁটে চলে এসেছে বাড়ি থেকে। দিল্লির রাস্তা, একটুও ভয় পায়নি। আমরা তো ভাবতেই পারি না।

তারপর কুলদীপের দিকে ফিরে বললো, ওর কাছ থেকে সব শুনলাম। আপনি সত্যি ভাগ্যবান, কুলদীপ। এমন জেদী, এমন তেজী, এমন খাঁটি মেয়ে আমি আগে কখনো দেখিনি।

নীনা আপত্তি জানিয়ে কিছু একটা বলতে গিয়ে ছোট্ট একটা হাঁচি দিল।

প্রভা বললো, ওকে একটু ব্র্যান্ডি দাও। ঠাণ্ডা লেগে যাবে মেয়েটার।

সারিন বললো, আনো, আনো, ব্র্যান্ডি আনো, সবাই খাবো। লেট আস সেলিব্রেট !

এরপর অনেকক্ষণ আড্ডা ও জল্পনা-কল্পনা হলো।

খুব তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। রেজিস্ট্রারকে নোটিস দিতে হয়। দিল্লিতেও ওরা থাকতে চায় না। সারিন সকাল হতে না হতেই এয়ারলাইনসের এক কর্তাকে ফোন করে লাদাখের টিকিটের ব্যবস্থা করলো। কিন্তু এয়ারপোর্টে পৌঁছোতে গেল না সারিন। গুরুত্বপূর্ণ পদের সরকারি অফিসার হিসেবে সারিনকে খানিকটা সাবধান হতেই হবে। খবরের কাগজের

লোকেরা টের পেলে সারিনের নাম জড়িয়ে কত কি লিখবে তার ঠিক নেই।

ওদের একটা ট্যাক্সিতে তুলে দেবার আগে প্রভা বললো, ওদের আইনের বিয়ে যখন হয় হোক, তুমি এখন ওদের দুজনের হাত মিলিয়ে দাও না!

সারিন বললো, গন্ধর্ব মতে ওদের বিয়ে আগেই হয়ে গেছে। তুমি এখন ভারতীয় নারী হিসেবে ওদের যদি মেনে নিতে পারো, তা হলে তুমিই আশীর্বাদ করে দাও!

প্রভার হঠাৎ চোখে জল এসে গেল।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললো, আমি প্রাণ খুলে ওদের আশীর্বাদ জানাচ্ছি। নীনার মতন সাহসী মেয়ে যদি আমাদের দেশে আরও থাকতো—

সারিন বললো, নীনা, হনিমুন করতে গিয়ে যেন মাকালু অভিযানের কথা ভুলো না। কুলদীপ, তুমি কোনো কথা বলছো না কেন?

কুলদীপ বললো, এখন শুধু একটাই কথা আমার মনে হচ্ছে। নীনাকে যদি আমি কোলে করে নিয়ে ট্যাক্সিতে তুলতে পারতাম! নিজের পায়ের জোরে।

প্রভা বললো, এর উল্টোটা হতে পারে না! নীনাই আপনাকে কোলে করে ট্যাক্সিতে তুলবে!

কুলদীপের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সত্যিই নীনা তাই করে বসলো। ট্যাক্সি ছুটে গেল এয়ারপোর্টের দিকে।

॥ ১৩ ॥

কতদিন, যেন এক জন্ম পরে কুলদীপ আবার ফিরে এলো তুষার ঢাকা পাহাড়ে। কুলদীপ একেবারে শিশুর মতন খুশি হয়ে উঠলো। রাওয়াত ওদের জন্য একটা চমৎকার গেস্ট হাউস-এর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সেখানেই চললো নব দম্পতির হনিমুন।

কুলদীপ হুইল চেয়ার চালিয়ে বাজার করতে যায়। নীনা রান্না করে। কুলদীপ জীবনে কখনো বাজার করেনি। সে মুর্গী আর আলু কিনে আনে, কিন্তু মাংস রাঁধতে গেলে যে পেঁয়াজ লাগে তাও সে জানে না। আবার বাজারে ছুটতে হয়। নীনাও রান্না চাপিয়ে দিয়ে গল্প করতে করতে ভুলে যায়, পোড়া গন্ধ বেরুতেই সে রান্নাঘরের দিকে দৌড়োয়। এসব নিয়ে দু জনে প্রচুর হাসে। যে-কোনো গণ্ডগোলেই যেন কিছু আসে যায় না, সব কিছুতেই মজা!

শোবার সময় যখন ওরা দরজা বন্ধ করে, তখনো ভেতরে শোনা যায় হাসির

শব্দ।

একদিন নীনা বললো, আর কয়েকটা দিন বাদে আমার সিমলায় ট্রেনিং নিতে যাবার কথা। তা হলে কি এবার বাদ দেবো? এবারে আমার এক্সপিডিশানে যাওয়াও সম্ভব নয়।

কুলদীপ বললো, কেন সম্ভব নয়? নিশ্চয়ই তুমি যাবে! ট্রেইনিং ক্যাম্পেও যেতে হবে।

নীনা বললো, আমি চলে গেলে তুমি একলা থাকবে কি করে?

কুলদীপ বললো, খুব থাকতে পারবো। আগে বুঝি একলা থাকিনি ভেবেছিলাম, বাকি জীবনটাই তো একলা কাটবে। না, নীনা, তোমাকে এক্সপিডিশানে যেতেই হবে। তুমি ফিরে এসে আমাকে গল্প শোনাবে।

নীনা হাসতে হাসতে বললো, আসলে আমি খুব স্বার্থপর, জানো তো! তোমাকে বিয়ে করেছি এই জন্য যে পৃথিবীতে তুমিই একমাত্র স্বামী যে তার স্ত্রীকে পাহাড়ে চড়তে যেতে বারণ করবে না।

কুলদীপ বললো, আমি বারণ করলেও তুমি শুনতে না, সেটাও আমি ভালো করেই জানি! যা জেদী মেয়ে তুমি!

বিকেলের দিকে ওরা দুজনে বেড়াতে যায়। যে-কোনো দিকেই আকাশচুম্বী পর্বত। তুষারের ওপর শেষ সূর্যের আলো পড়ে অপূর্ব দেখায়।

সামনের দিকে বিস্ময়ের চোখ মেলে নীনা বললো, এত বিরাট, এত উঁচু পাহাড়, যেন আকাশ ছুঁয়ে আছে। এরও চূড়ায় মানুষ ওঠে? এখান থেকে যেন বিশ্বাসই করা যায় না।

কুলদীপ বললো, মানুষের জয়ের কোনো সীমা নেই। তুমি যখন চড়তে শুরু করবে, তখন দেখবে, তোমারও মনে হবে, যেমন ভাবেই হোক, চূড়ায় পৌঁছোতেই হবে! কষ্ট হবে খুব, কিন্তু ওপরে ওঠার পর মনে হবে, এমন কিছু তো নয়! সত্যি বলছি তোমাকে, এভারেস্টের চূড়ায় ওঠার পর আমার আনন্দ হয়েছিল ঠিকই, আবার এ রকম একটা অনুভূতিও হয়েছিল, এই শেষ নাকি? এর চেয়েও আরও উঁচু নেই?

নীনা বললো, কুলদীপ, আমি আগে ভেবেছিলাম, আমি চলে গেলে তোমার একা থাকতে কষ্ট হবে! কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমি নিজেই পারবো না! তোমাকে ছেড়ে আমি একা থাকবো কি করে?

কুলদীপ বললো, তুমি তো একা থাকবে না। আমি যাবো তোমার সঙ্গে সঙ্গে। তুমি একদিন কি বলেছিলে মনে নেই? তুমি যেখানেই যাও, আমি

থাকবো তোমার পাশে পাশে ছায়ার মতন।

ওদের কথার মাঝখানে এসে পড়লো একটি লোক। মাথায় ময়লা চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গায়ে একটা ছেঁড়া ওভারকোট, দু বগলে ক্রাচ। ভাঙা ভাঙা গলায় সে বললো, নমস্তে মেজর সিংজী।

কুলদীপ চমকে উঠলো। প্রথমে চিনতে পারলো না লোকটিকে।

লোকটি হাসলো। আবার বললো, আচ্ছা হায় তো, সিংজী? শুনেছি আপনি শাদী করে বিবিজীকে নিয়ে এখানে এসেছেন।

কুলদীপ এবার দারুণ বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠলো, ফু দোরজি!

তারপরই সে দু হাত বাড়িয়ে দিল। ফু দোরজি ঝুঁকে আলিঙ্গন করলো কুলদীপকে।

কুলদীপ আর্তভাবে জিজ্ঞেস করলো, তোমার পায়ে কি হয়েছে? তুমি ক্রাচ নিয়েছো?

ফু দোরজি খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে বললো, একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল!

নীনার দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বললো, নমস্তে ভাবীজী।

কুলদীপ বললো, নীনা, ফু দোরজি বিখ্যাত শেরপা। আমাদের কত রকম সাহায্য করেছিল, তুমি জানো না। আমাকে দু তিনবার প্রাণে বাঁচিয়েছে। ওর সাহায্য ছাড়া আমি পীকে উঠতেই পারতাম না। ফু দোরজি, তুমি এখানে কি করছো?

ফু দোরজি বললো, আমি এখন এখানেই থাকি। পাহাড়ে চড়া তো বরবাদ হয়ে গেছে।

নীনা জিজ্ঞেস করলো, আপনার পায়ে কি হয়েছে?

ফু দোরজি উদাসীন ভাবে বললো, একটা পা জখম হয়ে গেছে। আপনারা কতদিন থাকবেন এখানে?

কথাবার্তা বেশিদূর এগোলো না। একটা জিপগাড়ি এসে থামলো ওদের কাছে। দুটি যুবতী ও দুজন পুরুষ তার থেকে নেমে এগিয়ে এলো ওদের দিকে। একজন পুরুষ বিগলিত ভাবে বললো, আপনিই তো মেজর কুলদীপ সিং? একটু আগে খবর পেলাম আপনি এখানে এসেছেন। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

একটি যুবতী বললো, আমাকে একটা অটোগ্রাফ দেবেন?

অন্য যুবতীটি বললো, আমাদের বাংলোয় চা খাবেন চলুন। আমার বাবা

আর্মির রিটায়ার্ড জেনারেল। আপনাকে দেখলে খুব খুশি হবেন।

আলাপ পরিচয়ের পর ওদের পেড়াপিড়িতে কুলদীপ ও নীনাকে যেতেই হলো ওদের সঙ্গে চা খেতে। এর এক ফাঁকে ফু দোরজি কখন চলে গেছে কেউ লক্ষ করেনি। কুলদীপ কয়েকবার ডাকাডাকি করেও সাড়া পেল না।

চায়ের আসর থেকে সন্ধের পর বাংলোতে ফিরে কুলদীপ বিষণ্ণ হয়ে রইলো। নীনা কয়েকটা চিঠিপত্র লিখলো, তারপর কুলদীপের কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে বারান্দায় এসে দেখলো, কুলদীপ বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছে। নীনার সাড়া পেয়েও ফিরে তাকলো না।

নীনা তার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে কুলদীপ ?

কুলদীপ বললো, মনটা খুব খারাপ লাগছে। ফু দোরজি আমার কত বড় বন্ধু তুমি জানো না। ওর সঙ্গে ভালো করে কথা বলা হলো না, ও চলে গেল।

নীনা বললো, ওর পা নষ্ট হলো কি করে ? একজন শেরপা'র যদি পা নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে তো তার আর কিছুই থাকে না !

কুলদীপ বললো, ওর কি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল, সেটাও জানা হলো না। জানো নীনা, এই সব শেরপাদের সাহায্য ছাড়া পৃথিবীর কোনো মাউন্টেনিয়ার হিমালয়ে উঠতে পারে না। এরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও আমাদের সাহায্য করে। শিখর জয় করবার পর আমরা যে-যার জায়গায় ফিরে যাই, ওদের ভুলে যাই।

নীনা বললো, হয়তো ঠিক সময় চিকিৎসা করলে ওর পা-টা ঠিক হয়ে যেত।

কুলদীপ বললো, তোমাকে আমার বন্ধু রবির কথা বলেছি। কি দারুণ প্রাণবন্ত ছিল সে। রবি উৎসাহ না দিলে আমি কোনোদিন মাউন্টেনিয়ার হতে পারতাম না। সেই রবি এখন একটা ভেজিটেবল। আমি যা চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছি, রবি তা পায়নি, কারণ সে এভারেস্ট জয় করেনি। কিন্তু আমার জয় করা আর রবির জয় না করার মধ্যে তফাত অতি সামান্য ! রবির জন্য আমার নিজেকেই অপরাধী মনে হয়।

নীনা চুপ করে রইলো।

কুলদীপ আবার বললো, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে, ফু দোরজির কি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। কেন তখন ঐ লোকগুলোর পাল্লায় পড়ে চা খেতে গেলাম শুধু শুধু !

নীনা বললো, মিঃ রাওয়াতের কাছ থেকে জানা যাবে। উনি নিশ্চয়ই

জানেন।

কুলদীপ বললো, রাওয়াত আজ সকালে শ্রীনগরের দিকে গেছে। চারদিন পরে ফিরবে। আমার এক্ষুনি জানতে ইচ্ছে করছে। নীনা, তুমি একটু একলা থাকো, আমি ফু দোরজির খোঁজ করে আসি।

নীনা বললো, এই অন্ধকারের মধ্যে যাবে ?

কুলদীপ বললো, না গেলে রাত্তিরে আমার ঘুম হবে না।

নীনা বললো, চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

কুলদীপ দু' একবার আপত্তি করলেও নীনা শুনলো না। নীনা কুলদীপের হুইল চেয়ার নামালো সিঁড়ি দিয়ে। তারপর দুজনে চললো।

খুব বেশি দূর যেতে হলো না অবশ্য। দু একটা জায়গায় খোঁজ করেই ওরা একটা বস্তিতে পৌঁছোলো। তার ভেতরের চত্বরে দেশি মদের আসর বসেছে। একটা হ্যাজাক বাতি জ্বলছে, সেটাকে গোল করে ঘিরে বসেছে মদ্যপায়ীরা।

স্থানীয় একটা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কুলদীপ আর নীনা এসে গেল সেই চত্বরে। তাদের দেখেই ফু দোরজি ক্রাচ ঠকঠকিয়ে কাছে এসে বললো, আরে কুলদীপসাব, তুমি এই ঠাণ্ডায় বেরিয়েছো কেন ?

কুলদীপ বললো, ফু দোরজি, তখন কিছু লোক এসে গেল, তুমি অমনি চলে গেলে ? তোমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে পারিনি, মাফ করো ভাই।

ফু দোরজি এখন বেশ মাতাল। সে ফুর্তির সঙ্গে বলে উঠলো, আরে ওসব বাত ছোড় দিজিয়ে। দারু পিও ! মজাসে দারু পিও !

হাঁক ডাক করে সে একজনকে দিয়ে মদ আনালো। দুটো গেলাশ ঢেলে একটা দিল কুলদীপকে। অন্যটা নীনার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনি নেবেন ?

কুলদীপ চোখের ইঙ্গিত করতে নীনা নিয়ে নিল গেলাশটা।

ফু দোরজি নিজের গেলাশ মুখের কাছে নিয়ে বললো, চিয়ার্স। ফর ওলড্ টাইম্স সেক।

এক চুমুকে সে পান করলো গেলাশ। কুলদীপ আর নীনাও চুমুক দিল অনেকটা।

কুলদীপ বললো, ফু দোরজি, এবার বলো, কী করে তোমার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল ?

উত্তর না দিয়ে ফু দোরজি হেঁড়ে গলায় একটা গান গেয়ে উঠলো।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে কুলদীপ হঠাৎ বলে উঠলো, নীনা, আমি মন স্থির করে ফেলেছি। আমি চাকরি ছেড়ে দেবো। কি হবে চাকরি করে। আমি একটা হাসপাতাল বানাবো।

নীনা অবিশ্বাসের সুরে বললো, হাসপাতাল ?

কুলদীপ বললো, হ্যাঁ। এই সব পাহাড়ের মানুষজন সামান্য অ্যাকসিডেন্টেই পঙ্গু হয়ে যায়। ঠিকমতো চিকিৎসা করলে তারা আবার পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। বিদেশে এরকম কত চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশেই বা থাকবে না কেন ? আমি সে রকম একটা আধুনিক চিকিৎসার হাসপাতাল বানাবো।

নীনা বললো, হাসপাতাল বানাবার তো অনেক খরচ। তুমি পারবে কি করে ?

কুলদীপ বললো, শেরপাদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে। চূড়ায় কি করে উঠবো তা নিয়ে ভাবতে নেই। চূড়ায় উঠতেই হবে, শুধু এটাই ভাবতে হয় !

নীনা বললো, কিন্তু তুমি একা একটা হাসপাতাল বানাবে ?

কুলদীপ বললো, কে বললো আমি একা ? তুমি সঙ্গে থাকবে।

তক্ষুনি কুলদীপ চিঠি টাইপ করতে বসলো। সে চিঠি লিখতে লাগলো পৃথিবীর নানান দেশের পর্বত-অভিযান সংস্থাগুলোর কাছে। তারা সবাই হিমালয়ের বিভিন্ন চূড়া জয় করতে আসে, হিমালয়ের মানুষজন সম্পর্কেও তাদের দায়িত্ব আছে।

কয়েকদিন পরেই ওরা লাদাখ থেকে নেমে এলো সিমলার কাছাকাছি একটা জায়গায়। বেশ ছোট্ট ছিমছাম একটা আধা-শহর। প্রচুর গাছপালা। যেখান থেকে সেখান থেকে দেখা যায় উঁচু উঁচু পর্বত চূড়া।

এখানে একটা বাড়ি ভাড়া নিল কুলদীপ। নীনা সিমলায় ট্রেনিং নিতে গেলে মাঝে মাঝে এসে কুলদীপের সঙ্গে দেখা করে যেতে পারবে। দিল্লি থেকে শের সিংকে আনিয়ে নেওয়া হলো সংসার সামলাবার জন্য।

নীনার বাড়ির লোকেরা আর বিশেষ গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করেনি। শুধু নীনার এক জ্যাঠতুতো ভাই এলো দেখা করতে। নীনা তাকে বললো, বাবা-মাকে বলবি, আমি চমৎকার আছি। এর চেয়ে ভালো থাকার কথা আমি কল্পনাই করতে পারি না।

হাসপাতাল বানাবার নেশায় কুলদীপ যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকদিন বাড়ি থেকে সিমলা পর্যন্ত যাতায়াত করতে লাগলো, আলাপ-আলোচনা চালাতে

লাগলো সরকারি অফিসারদের সঙ্গে। কেউই তাকে উৎসাহ দিচ্ছে না। এতবড় একটা প্রজেক্টের টাকা আসবে কোথা থেকে? কুলদীপ তবু অদম্য। তার ব্যস্ততা এখন যে কোনো সাধারণ মানুষের চারগুণ অন্তত। শুভানুধ্যায়ীরা বলতে লাগলো, এত পরিশ্রম কোরো না, কুলদীপ, তুমি আবার অসুস্থ হয়ে পড়বে।

কুলদীপ তাতে কর্ণপাত করে না।

বিদেশ থেকে সে কয়েকটা আশাব্যঞ্জক উত্তর পেয়েছে। সিমলায় একটা পর্বতারোহীদের সম্মেলন হয়ে গেল, কুলদীপ সেখানে গিয়ে চাঁদা তুললো প্রত্যেকের কাছ থেকে। কুলদীপকে সেই সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে বলা হয়েছিল। সে রাজি হয়নি। পাহাড়ের কথা সে যেন ভুলে গেছে, পাহাড়ের মানুষের চিন্তা তাকে পেয়ে বসেছে। হাসপাতাল সে বানাবেই। এই হাসপাতাল হবে স্টোক ম্যান্ডেভিলের মতন, সমস্ত আধুনিক সরঞ্জাম থাকবে। রবির মতন আর কারুকে ভুল চিকিৎসায় জীবন নষ্ট করতে হবে না। বাড়িতে সে তার মাকে জানালো, তার অংশের জমি বিক্রি করে টাকা পাঠিয়ে দিতে।

হাসপাতালের জন্য একটা জমিও পছন্দ হয়ে গেছে। একটা ছোট পাহাড়ের গায়ে হঠাৎ একটা টেবিলের মতন কয়েক বিঘে সমতল জায়গা। পাশের পাহাড়টার গায়ে অসংখ্য ফুলের গাছ। জমিটার পেছন দিকে বরফ ঢাকা পাহাড়ের পটভূমিকা। আদর্শ পরিবেশ। হাসপাতাল আর তার পরিপার্শ্ব খুব পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর না হলে অসুস্থদের মন প্রফুল্ল থাকে না। আর মন প্রফুল্ল রাখাটাই যে চিকিৎসার কত বড় অঙ্গ, তা কুলদীপের চেয়ে বেশি কে জানে?

জায়গাটার বায়না করতে গিয়ে কুলদীপ একটা আঘাত পেল। অমন চমৎকার জায়গাটা পাওয়া যাবে না। সিমলার একজন ব্যবসায়ী আগেই সেটা লিজ নিয়ে রেখেছে, ওখানে একটা পাঁচ তারা হোটেল হবে। সেই হোটেল তৈরির কাজ শুরু হবে কিছুদিনের মধ্যেই।

কুলদীপ জেদ ধরলো, ঐ জায়গাটাই তার চাই। ভারতে কত হোটেল আছে, কিন্তু তার পরিকল্পনা মতন হাসপাতাল একটাও নেই। হোটেলের চেয়েও হাসপাতালটাই বেশি দরকার।

নীনা একদিন সিমলায় সেই ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করতে গেল। ফিরে এলো রাগে-দুঃখে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে। রঙ্গরাজ নামে সেই ব্যবসায়ীটি তাকে কোনো পাত্তাই দেয়নি।

চোখে জল নিয়ে ক্রুদ্ধ গলায় নীনা বললো, তুমি ঐ জায়গাটার আশা ছেড়ে

দাও, কুলদীপ ! আমাদের নতুন জায়গা খুঁজতে হবে ! ঐ রঙ্গরাজটা একেবারে চশমখোর ! ঐ সব লোককে গুলি করে মেরে ফেলা উচিত !

কুলদীপ বললো, প্রথমেই হার স্বীকার করবো ? কিছুতেই না ।

সিমলায় একটা মন্দিরে ভক্তদের প্রচুর ভিড় হয় ! রঙ্গরাজের মা সেখানে পুজো দিতে যান । মন্দিরের সামনে লাইন বেঁধে বসে থাকে কানা-খোঁড়া ভিখিরিরা । পুণ্য অর্জন করার জন্য অনেকে পুজো দিয়ে বেরিয়ে এসে সেই সব ভিখিরিদের দুটো-চারটে পয়সা দেয় ।

রঙ্গরাজের মা ভিখিরিদের পয়সা দিতে দিতে এগিয়ে এসে দেখলেন, লাইনের একেবারে শেষে একটা হুইল চেয়ারে বসে আছে এক সুদর্শন শিখ যুবক । রঙ্গরাজের মা বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ালেন ।

কুলদীপ হাত বাড়িয়ে বললো, মা, আমাকে কিছু দিন !

মহিলাটি বললেন, তোমাকে আমি কি দেবো, বাবা ?

কুলদীপ বললো, আপনার ছেলে যেখানে হোটেল বানাচ্ছে, সেই জমিটা আমাকে দিন । আমি সেখানে একটা হাসপাতাল গড়ে তুলবো । এই সব মানুষদের জন্য ।

হাত তুলে সে কানা-খোঁড়া ভিখিরিদের দেখালো ।

মহিলার চোখে জল এসে গেল । তিনি বললেন, ঠিক আছে বাবা, আমি আমার ছেলের সঙ্গে কথা বলবো । নিশ্চয়ই কথা বলবো ।

কিন্তু রঙ্গরাজ তেমন কিছু মাতৃভক্ত নয় । সে অনেকখানি পরিকল্পনা করে ফেলেছে, ব্যাঙ্ক লোন নিয়েছে, সে পিছিয়ে যেতে রাজি নয় । সে বিরক্ত হয়ে বললো, ঐ ল্যাংড়াটা আমার জমিতে নাক গলাতে এসেছে কেন ! হাসপাতাল বানাতে চায়, অন্য জায়গায় বানাক না ! ঠিক আছে, আমি তার হাসপাতালের জন্য দশ হাজার টাকা চাঁদা দিচ্ছি ! আর যেন সে আমাকে বিরক্ত না করে !

কদিন বাদেই শোনা গেল রঙ্গরাজ ঐ জমিটায় ফেন্সিং দিতে শুরু করেছে ।

দশ হাজার টাকার চেকটা পেয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল কুলদীপ । সে দান নিতে রাজি আছে, কিন্তু অবহেলার ভিক্ষে চায় না ।

নীনা বললো, তুমি এ জমিটার জন্য জেদ করে বসে থাকলে তোমার কাজই তো এগোবে না । অন্য জমি খুঁজতে হবে ।

কুলদীপ বললো, বেস ক্যাম্প থেকে যারা ফিরে যায়, তারা কোনোদিনও চূড়ায় উঠতে পারে না ।

নীনা বললো, কিন্তু এ জমিটা তো কিছুতেই পাওয়া যাবে না বোঝা যাচ্ছে ।

কুলদীপ বললো, দেখা যাক।

দিল্লি থেকে সারিন জরুরি বার্তা পাঠালো যে কুলদীপের ওরকম পাগলামি করার দরকার নেই। ওর পরিকল্পিত হাসপাতালের একটা প্রজেক্ট রিপোর্ট পাঠিয়ে দিক, সারিন ভারত সরকারকে দিয়ে সেটা তৈরি করাবে। সে সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তবে সিমলার কাছে এ গণ্ডগ্রামে ওরকম একটা আধুনিক হাসপাতাল দিয়ে কি হবে? দিল্লিতে বানানোই তো ভালো।

চিঠিটা পেয়ে কুলদীপ হাসলো। সরকারি উদ্যোগ! লাল ফিতের মাহাত্ম্য কুলদীপ কি জানে না? সরকার রাজি হলেও সেটা তৈরি হতে হতে কতকাল যে কেটে যাবে, কুলদীপের জীবদ্দশায় হবে কি না সন্দেহ।

সারিনের চিঠির কোনো উত্তর দিল না কুলদীপ।

ট্রেইনিং নেবার জন্য নীনাকে সিমলাতেই থাকতে হয়। মাঝে মাঝে কয়েক ঘণ্টার জন্য সে পালিয়ে এসে কুলদীপকে দেখে যায়। শের সিং এসে গিয়ে সংসার সামলাচ্ছে, সেজন্য খুব একটা চিন্তা নেই।

কয়েকটা দিন কুলদীপ গুম হয়ে বসে রইলো বাড়িতে। কারুর সঙ্গে কথা বলে না, কোনো চিঠিও লেখে না। তাকে দেখলে মনে হবে, তার হাসপাতাল বানাবার ইচ্ছেটা যেন ঝিমিয়ে গেছে।

একদিন দুপুরে সে শের সিংকে বললো, তুমি আমার গ্রামের বাড়িতে চলে যাও। অনেকদিন বাবা-মায়ের কোনো খবর পাইনি। খবরটা নিয়ে এসো।

শের সিং অবাক হয়ে বললো, আমি পাঞ্জাবে যাবো? এখানে তোমাকে কে দেখবে?

কুলদীপ বললো, আমার কোনো অসুবিধে হবে না। হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে নেবো। হোটেলে মংরু নামে যে বাচ্চা ছেলেটা আছে, সে আমার অন্য কাজ করে দেবে।

শের সিং তবু যেতে রাজি নয়। কুলদীপ ধমক দিয়ে, চ্যাঁচামেচি করে জোর করে তাকে পাঠিয়ে দিল।

তারপর কুলদীপ একটা বড় বোর্ডে পোস্টার আঁকতে লাগলো। রঙিন হরফে লিখলো, 'এভারেস্ট হসপিটাল'।

সন্ধের সময় একটা কাচের গেলাশ ভর্তি জল শেষ করলো এক চুমুকে। তারপর গেলাশটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, এই শেষ!

পোস্টারটা এক হাতে নিয়ে হুইল চেয়ার চালিয়ে বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে। জামা, সোয়েটার, জ্যাকেটের ওপর উইন্ড চিটার পরা, হাতে পুরু

দস্তানা, চোখে চশমা, মাথায় কান ঢাকা টুপি। যেন আবার সে যাচ্ছে পর্বত অভিযানে।

লোকালয় ছাড়িয়ে তার মনোনীত জমিটার ঠিক মাঝখানে গিয়ে সে পোস্টারটা পুঁতে দিল মাটিতে। তারপর বসে রইলো তার পাশে। সারা রাত।

জমিটার ফেন্সিং গাঁথার কাজ চলছে। সকালবেলা কন্ট্রাক্টর ও তার মজুররা এসে অবাক। কন্ট্রাক্টর ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললো, কি ব্যাপার, আপনি এখানে...'

কুলদীপ বললো, তোমরা ফেন্সিং-এর কাজ করতে চাও করো। কিন্তু আমার ধারে কাছে আসবে না। আমার গায়ে কেউ হাত দিতে এলে আমি গুলি করে দেবো।

রঙ্গরাজ দিল্লিতে। কোনো সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে কন্ট্রাক্টর কাজ বন্ধ করে চলে গেল।

কিছু কিছু কৌতূহলী লোক দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো এই অদ্ভুত দৃশ্য। মাটিতে গাঁথা একটা পোস্টারের পাশে হুইল চেয়ারে বসে আছে একজন মানুষ। কুলদীপের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সে সঙ্গে কয়েকখানা বই এনেছে। চোখের সামনে একখানা বই মেলে ধরা।

সন্ধেবেলা স্থানীয় দুজন লোক এসে বললো, সিংজী, আপনি এখানে সারারাত বসে থাকবেন ? ঠাণ্ডা লেগে মারা যাবেন যে।

কুলদীপ বললো, আমি শূন্যের নীচে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি ঠাণ্ডাতেও রাত কাটিয়েছি। আমি সহজে মরবো না।

তারা বললো, আপনার জন্য কিছু খানা আর গরম কফি এনে দেবো ?

কুলদীপ বললো, বহুৎ শুকরিয়া। কিন্তু আমি কিছুই খাবো না। খাবার ইচ্ছে নেই।

খবরটা রটে যেতে দেরি হলো না। রাত্তিরেও অনেকে কুলদীপকে দেখতে এলো। সকলের চোখে বিশ্বাস আর সম্ভ্রম। লেপ-কম্বলের আরামের বিছানা ছেড়ে একজন মানুষ স্বেচ্ছায় এই শীতের মধ্যে বসে থাকবে খোলা আকাশের নীচে ? এ কি অতিমানব, না উন্মাদ।

নীনার কাছে খবর পৌঁছোলো পরদিন বিকেলে। একটা গাড়ি ভাড়া করে সে ছুটে এলো। তখন সেখানে রীতিমতন ভিড় জমে গেছে। লোকেরা খানিকটা দূরত্ব রেখে গোল করে ঘিরে আছে কুলদীপকে। সেই ভিড় ঠেলে দৌড়ে এলো নীনা, কুলদীপ হাসি মুখে চেয়ে আছে।

কাছে আসতেই কুলদীপ বললো, শোনো প্রথমেই একটা কথা বলে রাখি। তুমি আমাকে আর যা খুশি বলতে পারো, কিন্তু এখান থেকে উঠে যাবার কথা উচ্চারণ করবে না। আমার মা এসে কান্নাকাটি করলেও আমি যাবো না।

নীনা বললো, এই জেদের কী মানে হয়? এতে কী লাভ হবে?

কুলদীপ বললো, জেদী মেয়ে হিসেবে যে বিখ্যাত, তার মুখে আমি এ কথা শুনতে চাই না। অন্য কথা বলো। কি রকম হচ্ছে ট্রেইনিং?

কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা মাটিতে ফেলে দিল নীনা। তারপর বললো, গুলি মারো ট্রেইনিং! আমিও তোমার পাশে বসে থাকবো। তাতে তো তুমি আপত্তি করতে পারবে না?

কুলদীপ ইয়ার্কির সুরে বললো, খুকি, বসতে পারো। কিন্তু তার আগে শুনে রাখো, খিদে পেলেও এখানে বসে কোনো খাবার খাওয়া চলবে না। আগে এক গেলাশ জল খেয়ে নাও। এরপর জলও খেতে পাবে না।

মাটিতে একটা চাদর পেতে বসে নীনা কুলদীপের কোলে মাথাটা রাখলো। তারপর বললো, আমাকে একটু আদর করে দেবে তো মাঝে মাঝে? তাতেই হবে।

নীনার মতন একটি যুবতী মেয়েরও অনশনে খোলা আকাশের নীচে বসে যাওয়ায় দৃশ্যটি আরও আকর্ষণীয় হলো।

আগুনের মতন খবর ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। দূর দূর অঞ্চল থেকে আসতে লাগলো মানুষ। তারা একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কেউ নানারকম প্রশ্ন করে, ওরা কোনো উত্তর দেয় না। দু'জনে শুধু নিজেদের নিয়েই মশগুল।

ছুটে এলো সাংবাদিকরা। দেশ-বিদেশে খবর ছড়িয়ে গেল যে এক এভারেস্টজয়ী বীর পাহাড়ী মানুষদের জন্য হাসপাতাল খোলার দাবিতে আমৃত্যু অনশনে বসেছে। দিল্লি থেকে উড়ে এলো সরকারি প্রতিনিধি। তারা স্তোকবাক্য দিয়ে কুলদীপের অনশন ভাঙাতে চায়। কুলদীপ অনড়।

সাধারণ মানুষের সমর্থন পেয়ে গেল কুলদীপ আর নীনা। পাঁচ দিন কেটে গেছে, ওরা জল পর্যন্ত খায়নি। জোর করে ওদের কিছুই খাওয়ানো যাবে না, কিন্তু ঠাণ্ডায় যাতে কষ্ট না হয় তাই জনসাধারণই একটা তাঁবু টাঙিয়ে দিল। দু চারজন পুলিশও এসেছিল, কিন্তু জনসাধারণের চিৎকারে তারা কাছে যেতে সাহস করেনি।

লোকেরা স্বতঃস্ফূর্ত স্লোগান দিচ্ছে, হোটেল চাই না, হাসপাতাল চাই!

কেটে গেল সাতদিন। এর মধ্যে ঘুরে গেছেন বেশ কয়েকজন জননেতা। কুলদীপের পক্ষে-বিপক্ষে জোর তর্ক চলছে। কিন্তু একজন যদি আগে থেকেই জমিটা কিনে নেয় এবং বিক্রি করতে না চায়, তা হলে তার কাছ থেকে জমিটা নিয়ে নেওয়া হবে কী করে? সরকার অ্যাকোয়ার করতে পারে, কিন্তু সরকার তো হাসপাতালটা বানাচ্ছে না।

সপ্তম দিনে কুলদীপ আর নীনা দুজনেই খুব দুর্বল হয়ে গেছে। কুলদীপ ভালো করে কথা বলতে পারছে না, তার জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে। দুজন ডাক্তার এসে তাকে পরীক্ষা করে বললো, এখন জল না খেলে তার কিডনির সাঙ্ঘাতিক ক্ষতি হবে। নীনাও অনুরোধ করলো, তুমি শুধু একটু জল খাও।

কুলদীপ প্রবলবেগে মাথা নাড়লো।

তার শীর্ণ হয়ে আসা মুখখানি যেন তপঃক্লিষ্ট সাধকের মতন জ্বলজ্বল করছে।

সারিন খবরের কাগজ পড়ে সব জেনেছে। কিন্তু সে তখন সফর করছিল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে। ভেতরে ভেতরে ছটফট করছিল সে, কিন্তু আসতে পারছিল না। মেডিক্যাল বুলেটিনে কুলদীপের স্বাস্থ্যের খবর পেয়ে সে আর থাকতে পারলো না। প্রধানমন্ত্রীকে ঘটনাটা জানালো সে। ইন্দিরা গান্ধী সহানুভূতি দেখিয়ে সারিনকে তক্ষুনি যেতে বললেন সিমলায়। যেমন করেই হোক, কুলদীপকে বাঁচাতেই হবে।

সারিন উড়ে চলে এলো সিমলায়।

এখন কুলদীপ আর নীনাকে ঘিরে রয়েছে কয়েক হাজার মানুষ। তারা সবাই শ্লোগান দিচ্ছে, হোটেল চাই না, হাসপাতাল চাই। হোটেল চাই না, হাসপাতাল চাই। বিদেশী প্রেস ফটোগ্রাফারদের ফ্ল্যাশ বাল্‌ব জ্বলে উঠছে ঘনঘন।

ভিড় সরিয়ে সারিন কাছে এসে দাঁড়ালো। মাথা নাড়তে নাড়তে বললো, আর একটা রেকর্ডও বুঝি করতে চাও, কুলদীপ?

কুলদীপ মিনমিন করে বললো, আমাদের এক পূর্ব পুরুষ ভগৎ সিং জেলখানার মধ্যে কতদিন অনশন করেছিলেন বলতে পারো? তাঁর রেকর্ড কি ভাঙতে পারবো?

সারিন বললো, ভগৎ সিং ছিলেন তাগড়া জোয়ান। তুমি এমনিতেই পুরোপুরি সুস্থ নও। তোমার লাংস ড্যামেজ্‌ড।

নীনার দিকে ফিরে বললো, এ সব কী ছেলেমানুষি হচ্ছে? ঐ পাগলাটাকে

আটকাতে পারোনি ? তোমরা দুজনে মিলে একটা অতবড় হাসপাতাল বানাবে ?

নীনা বললো, আগে ঠিক বিশ্বাস হয়নি আমারও। কিন্তু দেখুন, এত লোক আমাদের সাপোর্ট করছে, এখন বিশ্বাস হচ্ছে যে পেরে যাবো।

সারিন আরও কিছু বলার আগেই জনতা হঠাৎ হৈ-হৈ করে উঠলো। কি যেন একটা গোলমাল হয়েছে।

ওরা ফিরে তাকিয়ে দেখলো, লোকেরা হাতে হাতে ধরাধরি করে শৃঙ্খল বানিয়ে কাকে যেন ঢুকতে দিচ্ছে না। তবু সেই শৃঙ্খল ঠেলে এগিয়ে এলেন একজন বয়স্কা মহিলা। সাদা শাড়ি পরা, টুকটুকে ফর্সা রং।

রঙ্গরাজের মা।

তিনি বসে পড়লেন নীনার পাশে। ঠেলাঠেলিতে হাঁপিয়ে গেছেন, প্রথমে একটু দম নিলেন। তারপর কুলদীপকে বললেন, বাবা তুমি ঠিকই করেছো। আমি আমার ছেলেকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি। সে কিছুতেই শুনবে না। তুমি যদি এখানে বসে মারা যাও, তা হলে আমাদের বংশের অকল্যাণ হবে। অভিশাপ লাগবে। তোমার মৃতদেহের ওপর এখানে হোটেল তৈরি হলে সেখানে লোকেরা এসে আমোদ-প্রমোদ করবে ? এই সব ভেবে আমি গত তিন রাত ঘুমোতে পারিনি।

তারপর তিনি নীনার দিকে ফিরে বললেন, মা, আমিও তোমার পাশে বসবো। মরতে যদি হয়, তা হলে আমিই আগে মরবো। আমার মৃতদেহের ওপর আমার ছেলে হোটেল বানাক।

কিছু লোক কথাগুলো শুনে জয়ধ্বনি করে উঠলো।

কুলদীপ সারিনকে বললো, তুমিও আমাদের পাশে বসে যাবে নাকি ?

একটু পরেই ঘটনাটা আরও একটা নাটকীয় মোড় নিল। সদলবলে এই রঙ্গস্থলে উপস্থিত হলো রঙ্গরাজ। সিল্কের শেরওয়ানি পরা, মাথায় পাগড়ি।

সোজা এসে সে তার মায়ের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বললো, মা, ওঠো।

মা বললেন, তুই দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে।

রঙ্গরাজ মায়ের পা ছুঁলো দু হাত দিয়ে। তারপর সে হাত জোড় করে কুলদীপ আর নীনার দিকে ফিরে বললো, আমি মাপ চাইতে এসেছি। আমার ঘরে বউ-বাচ্চা আছে, তাদের ওপর রাগ করবেন না।

পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে সে মায়ের কোলের ওপর রেখে আবার বললো, তুমি এটা ওঁদের দিয়ে দাও।

সারিন কাগজটা খুলে দেখলো।

তারপর বললো, এটা দানপত্র। এই ভদ্রলোক জমিটা তোমার হাসপাতালের জন্য নিঃশর্তে দান করেছেন, কুলদীপ!

কাগজটা তুলে জনতার দিকে দেখিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল সারিন। তারপর বললো, আমি প্রাইম মিনিস্টারের একটা বার্তা নিয়ে এসেছি। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর নিজস্ব ফান্ড থেকে এই হাসপাতালের জন্য পাঁচ লাখ টাকা দেবেন।

সাধারণ লোকেরা উল্লাসে নৃত্য শুরু করে দিল। অনেকে ছুটে এলো কুলদীপের পায়ের ধুলো নেবার জন্য।

কুলদীপ আর নীনা রঙ্গরাজের মায়ের হাত থেকে চিনি মেশানো জল পান করলো একটু একটু করে। সারিন পকেট থেকে একটা চকোলেট বার করে নীনাকে বললো, এই নাও তোমাদের জেদের পুরস্কার।

দুদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলো কুলদীপ। আবার তাকে কাজে লাগতে হবে। সন্ধেবেলা নিজের বাড়িতে নীনাকে পাশে বসিয়ে সে বললো, রং পেন্সিল দাও, আমি হাসপাতালটা এঁকে ফেলি।

কুলদীপ তার স্বপ্নের হাসপাতালটা আঁকতে লাগলো দ্রুত টানে। নীনাকে বোঝাতে লাগলো, এই দ্যাখো, এটা একটা লম্বা বারান্দা, এখানে অফিস ঘর, রিক্রিয়েশান রুম হবে অন্তত পাঁচটা...

কুলদীপ ছবি এঁকে যেতে লাগলো। এক সময় নীনা বললো, তোমার একটা ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে। আমি নিয়ে আসছি।

ওষুধটা এনে নীনা দেখলো, কুলদীপ ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুমের মধ্যে কুলদীপের স্বপ্নে তার আঁকা ছবিটা বাস্তব হয়ে গেল। ঝকঝক তকতক করছে একটা নতুন হাসপাতাল। ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে লোকজন। একটা হুইল চেয়ারে করে নিয়ে যাওয়া হলো রবিকে। সে খুব করুণ সুরে একটা গানের লাইন গুনগুন করছে। ইংল্যান্ডের হাসপাতালের নার্স মেরি এসে একবার দেখে গেল কুলদীপকে। কুলদীপ বসে আছে বারান্দায় নিজের চেয়ারে। একটা কৃত্রিম পা লাগিয়ে টক টক করে হেঁটে যেতে যেতে কুলদীপের দিকে তাকিয়ে একবার হাসলো ফু দোরজি। চেনাশুনো আরও অনেকে। সবাই কাজ করছে, সবাই ব্যস্ত।

আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে এলো। কোথায় একটা রেডিও বাজছে, তাতে শোনা যাচ্ছে যুদ্ধের খবর। বিকট শব্দ করে উড়ে গেল একটা জেট বিমান।

সমস্ত হাসপাতালটা এখন জনশূন্য। শুধু সামনের চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছ'সাত বছরের শিশু। তার দু পায়ে প্লাস্টার করা। সে হাঁটতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে বারবার।

বারান্দার সিঁড়ির পাশে এমনভাবে জায়গা করা আছে, যেখান দিয়ে হুইল চেয়ার নিয়ে ওঠা-নামা করা যায়। কুলদীপ চত্বরে নেমে এলো। ছেলেটার হাত ধরে বললো, আমার সঙ্গে সঙ্গে চলো।

ছেলেটি কুলদীপের হাত ধরে পাশে পাশে হাঁটতে লাগলো।

চত্বরটির একদিকে একটা লম্বা মতন গম্বুজ। তার দরজাটা খোলা। তার সামনে এসে ছেলেটি বললো, আমি ওপরে যাবো! পারবো না?

কুলদীপ বললো, নিশ্চয়ই পারবে। অনেক-অনেক ওপরে। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জায়গা কোথায় তুমি দেখবে? উঠে যাও এই সিঁড়ি দিয়ে।

ছেলেটি বললো, তুমি যাবে না? তুমিও চলো।

কুলদীপ বললো, তা হলে তোমাকেই নিয়ে যেতে হবে আমায়। আমাকে টেনে তোলো।

ছেলেটি কুলদীপের হাত ধরে জোরে টানতেই সে উঠে দাঁড়ালো। তারপর দুজনেই উঠতে লাগলো সিঁড়ি বেয়ে।

গম্বুজের চূড়ায় যখন পৌঁছোলো, তখন দুজনেরই পা অক্ষত, স্বাভাবিক। ছেলেটি আনন্দে লাফালো দুবার।

সন্ধে হয়ে এসেছে, আকাশে প্রায় মিলিয়ে গেছে আলো। শুধু এক দিকে একটা রক্তবর্ণ শিখর ছুরির ডগার মতন জ্বলজ্বল করছে।

ছেলেটিকে পাশে টেনে কুলদীপ বললো, ঐ দ্যাখো! তোমাকে একদিন ওখানে যেতে হবে।

For More Books
Visit
www.BDeBooks.Com

BDeBooks.com

Read Online

pdf

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com